কমলার অদৃষ্ট

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

(১৩২৪ সাল)

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

উৎসর্গ-পত্র

পরম স্নেহাস্পদ, চিরাশীষভাজন

শ্রীমান পুলিনকৃষ্ণ সেন

কবিভূষণকে

স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত

হইল।

উপহার পৃষ্ঠা

এই পুস্তকখানি

আমার

প্রদত্ত হইল

তারিখ ঃ স্বাক্ষর

সন ঃ

বিয়ের-কনে—বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত সুলেখক শ্রীযতীন্দ্র-নাথ পাল প্রণীত। ২৫০ শত পৃষ্ঠা ব্যাপী সচিত্র সুন্দর স্ত্রী-পাঠ্য সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাস সাহিত্যে যুগান্তর। এমন ঘটনা বহুল স্ত্রী পাঠ্য সুন্দর উপন্যাস আর একখানিও নাই। রেশমে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা, মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

কমলিনী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার, এম, এ, বি, এল, প্রণীত অপূর্ব্ব সুন্দর উপন্যাস; যেমন ভাব তেমন ভাষা। এই পবিত্রময় ঘটনার সমাবেশ সকলেরই পাঠ করা উচিত। সিল্কে বাঁধান মূল্য ১৷৹ সিকা।

সঙ্গিনী—বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত সুলেখক শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। সঙ্গিনী, বঙ্গকুলললনা মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। বিবাহিত জীবনে যাহাতে রমণীর সুষমা নির্ম্মল হইয়া উঠে, এই পুস্তকে অতি সরলভাবে তাহারই পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে, রমণীর কি কি প্রয়োজন,—স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর কি কি সম্বন্ধ, সঙ্গিনীর ভূষণ,—সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থকার এমন সুন্দর সরল ভাষায়—লিখিয়াছেন যে বালিকা পর্য্যন্ত অতি সহজে বুঝিতে পারিবে। মূল্য ১৲ টাকা।

ছেলে মেয়েদের হাতে দিবার অপূর্ব্ব সামগ্রী।

(চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ছাপা, ছবিতে ভরা

(অপূর্ব্ব পুস্তক)

১। সাবিত্রী—।৹ আনা। ২। বেহুলা—।৹ আনা।

৩। প্রহ্লাদ—।৹ আনা। ৪। ধ্রুব—।৹ আনা।

হরিসাধন বাবুর কয়েকখানি (সচিত্র)

শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

মরণের পরে—সম্রাট সাহজাহানের আমলের এক চমকপ্রদ ঘটনাময় কাহিনী। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ হৃদয়স্তম্ভনকারী অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ, উপন্যাস খুব কমই বাহির হইয়াছে। সুন্দর এন্টিকে ছাপা, রেশমী কভার। সোণার জলে বাঁধন। ৩২০ পৃষ্ঠার উপর এই বইখানি। পাঁচখানি হাফটোন ছবি ইহাতে আছে। সে সুন্দর ছবির তুলনা নাই। মূল্য ১৸০ আনা।

হরিসাধন বাবুর দুইখানি সামাজিক উপন্যাস।

স্বর্ণপ্রতিমা—লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস। পুস্তকের যেমন ভাব, তেমনই ভাষা। উপহার দিবার অপূর্ব্ব সামগ্রী। সুন্দর ছাপা, চারখানি হাফটোন ছবি। রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সতীলক্ষ্মী (২য় সংস্করণ)—লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। যে পুস্তকের এক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সতীলক্ষ্মী বঙ্গসতীর উজ্জ্বল ছবি। রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী।
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

কমলার অদৃষ্ট

(১)

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের একটী কাহিনী, আমরা এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিব। তখন, সমাজের ও সমাজের লোকের অবস্থা অন্যরূপ ছিল।

তখন চালের দর ছিল, আড়াই টাকা মণ। ভাল ঘি, ত্রিশ টাকায় পাওয়া যাইত। গব্য ছিল, টাকায় একসের খাঁটি ওজন। দেশে, মাছ দুধের ও প্রাচুর্য্য ছিল। এখন যেমন টাকা সস্তা, অথচ বাঙ্গালী অন্নের কাঙ্গাল, তখন টাকা আক্রা ছিল, কিন্তু অন্ন হাতের ভাত ছিল।

মা বঙ্গজননী! আজ কোথায় তোমার সেই সুখের দিন, যে দিন মোটা তাঁতের কাপড়ে বাঙ্গালী নরনারী লজ্জা নিবারণ করিত? সকল গৃহস্থেরই চাষের ধান, পুকুরে মাছ, ক্ষেতে সব্‌জী, গোহালে গরু, বাড়ীতে কৃষাণ ছিল। বাঙ্গালীর দেহে স্বাস্থ্য ছিল। সংসারে সুখ ছিল। স্বজনে প্রীতি ছিল।

তখন বাঙ্গালীর দ্বার হইতে ভিখারি অতিথি ফিরিত না। আত্মীয় কুটুম্ব দুই দশ দিন আসিয়া থাকিলে, লোকে বিরক্তি বোধ করিত না। কাহারও বাড়ীতে কেহ মরিলে, অতি শত্রু যে, সেও

বুক দিয়া দাঁড়াইত। গ্রামের মুরুব্বিদের সকলে মান্য করিয়া চলিত। ধর্ম্ম ও নীতির বিরুদ্ধে কাজ করিলে, সমাজ তাহাকে শাস্তির বিধান করিত। পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, বারব্রত, পূজা-উৎসব সকল বাড়ীতেই কিছু না কিছু ছিল। কিন্তু তখন ছিল না—কেবল ম্যালেরিয়া, পরশ্রীকাতরতা—নীচ স্বার্থ, অন্য লোকের অকারণে অনিষ্ট চেষ্টা।

তবে কন্যাদায়ের অবস্থা, অন্য রকমে কষ্টদায়ক ছিল। বল্লাল আর দেবীবর ঘটক, কুলীনের কুল বাঁধিয়া দিয়া, থাক ঠিক করিয়া যে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—তাহার ফল তখন পূর্ণ ভাবে বঙ্গপল্লীতে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

এখন যেমন পাশে কৌলীন্য, তখনকার কৌলীন্য ছিল—বংশে। আর এই বংশরূপ ঝাড়ের পাকা বাঁশ হইতে কঞ্চি পর্য্যন্ত, উচ্চ ছাপা, চিহ্নিত। কিছুই ফেলা যাইত না।

তখন টাকা আক্রা ছিল—কৌলীন্যের মর্য্যাদা ছিল, কুলীন শ্রীহস্তগণের ঘরে পাত্রের অভাবে, মেয়ে খুব বড় হইয়া থাকিত। কিন্তু যাহা হইলেও তাহাদের বিবাহ আজকালকার মত একটা সর্ব্বনেশে ব্যাপার ছিল না।

এক একজন কুলীন বহুপত্নীক ছিলেন। এটা বল্লালের নয়, বাঙ্গালীর কলঙ্ক। কিন্তু তাহা হইলেও জামাতা অল্পে তুষ্ট হইতেন। তখন বিবাহে বার টাকা পণ, ছয় টাকা পণ হইলে চলিয়া যাইত। তখন রূপার থালায় মোহর সাজাইয়া দিয়া, সোনার বাটখারায় ছেলে ওজন করা হইত না। এখন ছেলের দর বাড়িয়াছে, মেয়ের দর

কমিয়াছে। তখনও প্রকারভেদে এই রকম পাত্রের অভাব ছিল বটে, কিন্তু পাত্র দুর্ম্মূল্য ছিল না। কন্যাদায় তখন একটা বড় দায় ছিল না। পিতৃমাতৃদায়ই প্রধান দায় ছিল। এখন ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছে।

আর ছিল না, তখন প্রত্যেক বঙ্গপল্লীতে ম্যালেরিয়া, ডিস্‌পেপ্সিয়া, নার্ভস-ডিবিলিটী, ডায়াবেটিস্, এসিডিটী, প্রভৃতি বড় বড় নাম যুক্ত সাংঘাতিক পীড়া আর তাহার শোচনীয় পরিণাম। তখনকার বাঙ্গালার শিশুদের মধ্যে এত অকালমৃত্যু ছিল না। গৃহিণীগণ খুব পাকা পোক্ত ছিলেন। প্রসবের পর সুতিকাগৃহ মধ্যে ডিপ্লোমা-ওয়ালা ধাত্রীর দরকার হইত না, অথবা ডাক্তারের ভিড় লাগিয়া যাইত না।

কুলের লক্ষ্মী কুলবধূরা, তখন স্বহস্তে পাক করিয়া, স্বামী, ভাসুর দেবর, পিতা, ভ্রাতা, প্রভৃতি গুরুজনদের পরিবেশন করিতে ভাল বাসিতেন। কেহ অপরিচিত অজানা গোত্রের ব্রাহ্মণের হাতের রান্না খাইতেন না। কাজেই এত উৎকলী ও বিষ্ণুপুরী ঠাকুরের প্রাচুর্য্য আদৌ ছিল না।

আর ছিল, সেই সুদূর অতীতে, বাঙ্গালীর পরম গৌরবের ও গর্ব্বের জিনিস, নারীর ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতা। তখন শ্বশ্রূ-ননন্দার তিরস্কার অতি দুষ্ট বধূরাও মুখ বুঝিয়া সহ্য করিতেন। দিনের বেলায়, স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার সাহস অনেকের ছিল না। বাঘিনীর মত ননদিনী ও শাশুড়ীর ভয়ে, বধূরা সকল বিষয়ে সাবধান হইয়া চলিতেন। তিরস্কৃত হইলে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেন—কেরোসিন তখন এদেশে

আসে নাই। থাকিলেও—বোধ হয় আজ কাল কার দিনে, আমরা নিত্যই যে সব বিভীষিকাময় ব্যাপারের কথা সংবাদপত্রে পড়িতেছি, সহিষ্ণুতার একান্ত অভাবজনিত পাপে. নারীগণের আত্মনাশ প্রবৃত্তির সমূহ বৃদ্ধি দেখিতেছি, তখন সে সব খুব কমই দেখা যাইত।

তখন—নীতি ও শাস্ত্র বাক্যের সম্মান ছিল, সামাজিক পাপের ভয় ও শাস্তি ছিল, দুষ্কর্মে ঘৃণা ছিল—অপকার্য্যের শাসন ছিল, প্রকারান্তরে স্বায়ত্ত-শাসন ছিল—কথায় কথায় লোকে আদালত ঘর করিত না। এখন মনে হয়—হায়! কোথায় সে সুখের দিন? দাও প্রভু! আমাদের সেই দিন ফিরাইয়া—সেদিন বাঙ্গলায় অন্ন ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, দুর্ভিক্ষ ছিল না, দুরাকাঙ্খা ছিল না। আত্মম্ভরিতা ও নীচ স্বার্থ জন্য, এত মনোবাদ ও দলাদলি ঘটিত না।

যাক্—এখন এসব কথা। সমাজের অবস্থাটা একটু আভাস দিয়া রাখিলাম, কেননা এই কাহিনীটি সেই সময়েরই কথা। এখনকার নয়।

বর্ত্তমানের ব্যাপার তো, আমাদের চোখের সম্মুখেই ঘটিতেছে। নিত্য যাহা ঘটিতেছে—নিত্য যাহা চোখে দেখিতেছি—নিজেদের সংসারের মধ্যে—যে গুলির নিত্য অভিনয় হইতেছে, তাহা আর তুলিকা ধরিয়া চিত্র করিতে হইবে কেন?

যাহা এখন ছিল না, যাহা এ যুগের লোক দেখে নাই, যাহা এখন অতীত যুগের কাহিনীর মত, উপকথায় মত দাঁড়াইয়াছে, তাহাই আমরা বিবৃত করিব। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের, পল্লীসমাজের একটী চিত্র চিত্রণ করিয়া পাঠকের চিত্ত রঞ্জন করিব।

(২)

কুন্দপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। ক্ষুদ্র হইলে কি হয়, তবুও তাহাতে একশত ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। কায়স্থপাড়া, বৈদ্য পাড়া, আগুরীপাড়া, কৈবর্ত্তপাড়া, বেনিয়াপাড়া প্রভৃতি বিভাগও সেই ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে দেখা যাইত।

এই কুন্দপুর অপভ্রংশে ক্রমশঃ কুঁদপুরে দাঁড়াইয়াছে। তাহা হইলেও তাহার শ্রীবৃদ্ধির কোন হানি হয় নাই।

গ্রামের মধ্যে চাকুরীজীবি লোক খুব কম। কেন না সকলেরই ক্ষেত খামার আছে। সকলেরই দুবেলার মোটা ভাত ও পরণের মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে।

এই গ্রামের ব্রাহ্মণ পাড়ায়, রমানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ক্রিয়াবান সাত্বিক ব্রাহ্মণ। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত, শ্রদ্ধা করিত, ভাল বাসিত।

সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে, সকলেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহায়তা পাইত। যে দিন তিনি কাহারও একটু উপকার করিতে পারিতেন, সে দিনটা তাঁহার মনের সুখেই কাটিয়া যাইত।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—ক্রিয়া কলাপাদি করিতেন, তাঁহার অবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হইলেও, এই সব ছোট খাট ক্রিয়াকলাপে দশজন তাঁহার বাড়ীতে পাত পাড়িত। আহারের ব্যবস্থা ত ভালই হইত, তাহার উপর তাঁহার মিষ্ট কথায়, আর যত্নখাতিরে, যাঁহারা তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিতেন, তাঁহারা দশমুখে তাঁহার সৌজন্যতার সুখ্যাতি করিতেন।

কমলার অদৃষ্ট

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তখন কৌলীন্যপ্রথার খুব প্রাবল্য। এজন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এক কুলের মুখুটী দেখিয়া, কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতার নাম—গোপাল গোবিন্দ হইলেও, গোপাল নামেই তিনি পরিচিত। কন্যার নাম কমলা।

এই কন্যা ছাড়া, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আর কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। বিবাহের পর, এই কুলীন জামাইকে তিনি দুই তিন বার নিজালয়ে আনিয়াছিলেন। তখন তাঁহার হাতে পয়সা ছিল, কুলীন জামাতার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিবার শক্তি ছিল। কাজেই জামাতা বাবাজী, এই মর্য্যাদার লোভে দুই তিন বার তাঁহার বাড়ীতে পদধূলি দিয়াছিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার নাম—কমলা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কুলীন কন্যা কমলার জন্মের পর হইতে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছিল। এজন্য তিনি আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন—কমলা।

এই কমলা—সত্য সত্যই রূপে গুণে কমলা। সে সুন্দর দেহে যেন রূপসম্পদ্ ধরিতেছে না। এক বার দেখিলে চোখের পলক না ফেলিয়া, আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। বালার্ককিরণস্পর্শে, সদ্য-বিকশিত শতদলের মত, হিমালয় কন্যা গৌরীর মত, অতি সুন্দর সেই মুখখানি। চোখের তারাদুটি মিশ কালো। মুখে যেন হাসি লাগিয়াই আছে। হাসিমাখা আরক্ত ঠোঁট দুটি, অতি মনোমোহন। শ্যামা-ঠাকুরুণের মত একরাশ কালো চুল, সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ, চম্পকনিভ কান্তি, সর্ব্বাঙ্গের সুন্দর নিখুঁত গঠন, যেন কমলাকে শোভার

আধার, সৌকুমার্য্যের আগার করিয়া তুলিয়াছিল। দেহে অন্য অলঙ্কার ছিল না—হাতে কেবল আয়তের চিহ্ন স্বরূপ দুই গাছি শাঁখা। জানি না, এ সোনার প্রতিমা, সোনা দিয়া সাজাইলে সোনার গহনাও, এ অপূর্ব্বরূপের ঝলকে জ্যোতিঃহীন হইয়া পড়িত কিনা?

কমলা পিতামাতার আদরিণী কন্যা। স্বভাবগুণে কমলা পাড়ার সকল বাড়ীতেই আদর পাইত। কর্ম্মকুশলা কমলা, এক দণ্ডও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না। নিজের বাড়ীতে কোন কিছু কাজ না থাকিলে, সে প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়া তাহাদের সংসারে অনেক কাজ করিয়া দিত। রোগীর সেবা করিতে. কমলা খুব মজবুত। পরের চোখে জল দেখিলে, কমলার চোখে জল আসে; পরের আনন্দ দেখিলে, সে বড়ই একটা আনন্দ বোধ করে।

কিন্তু কন্যার অদৃষ্ট ভাবিয়া চট্টোপাধ্যায় বড়ই অসুখী। কুলীন জামাতার কয়েক মাস ধরিয়া কোন সংবাদই নাই। কন্যা কিশোর-কাল সমুত্তীর্ণা। যৌবন পথবর্ত্তিনী। সে উছলিত লাবণ্যরাশি এক দিনের জন্য স্বামীর নেত্রের তৃপ্তি সাধন করিল না, সে সুমধুর কণ্ঠস্বর এ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্য স্বামীর কাণে গেল না। সে কোমল হস্তের পদসেবা, হতভাগ্য গোপালগোবিন্দের অদৃষ্টে ঘটিল না। কেন তাহার কারণ আছে। একবার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জামাতাকে আনিবার জন্য দশটী টাকা দিয়া এক জন লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু গোপালঠাকুর টাকা দশটী লইয়া, চাকরকে ফিরাইয়া দিয়াছেন! বলিয়া দিয়াছেন "ফুরসুৎ হইলে যাইব। রাহা-খরচ আমার কাছে জমা রহিল।"

কমলার অদৃষ্ট

গোপাল মুখুটীর সাত বিবাহ। কমলা তাঁহার শেষ পত্নী। এই সাতের মধ্যে তাহাকে দেখাইত ঠিক যেন চন্দ্রের রোহিণী। এক এক শ্বশুর বাড়ীতে দুই মাস করিয়া সেবা গ্রহণ করিলে, তাঁহার বছর কাটিয়া যায়। সুতরাং সকল বাড়ীতে তিনি আসেনই বা কখন! তাহার উপর কমলার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহার মত মহা-কুলীনের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিবার শক্তি যে তাঁহার নাই।

নানা ভাবনায়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ভাঙ্গিল। সাত দিনের জ্বরে তিনি সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিলেন। সারা গ্রামের মধ্যে, তাঁহার মৃত্যুতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাবিতেন, একটা বই মেয়ে নাই। তাতে আবার কুলীন জামাই করিয়াছি। ছেলে একটা থাকিলে, কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা না হয় করিয়া যাইতাম। যা জমি-জমা রহিল, তাহাতে আমার অবর্ত্তমানে, আমার স্ত্রী বিন্দুবাসিনী ও কন্যা কমলার একরকমে দিন চলিয়া যাইবে। যে কয়দিনের জন্য ভগবান এ সংসারে পাঠাইয়াছেন, কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া যাই। কিছুই ত রাখিয়া যাইতে পারিব না, তবু সুনামটা থাকিবে।"

এইজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে প্রকাশ পাইল, যে তিনি কিছু ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। স্বামীর শ্রাদ্ধ এবং এই ঋণ পরিশোধের জন্য, পত্নী বিন্দুবাসিনী কিছু জমি জমা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। রহিল কেবল বাস্তু ভিটা ও তৎসংলগ্ন একখানি বাগান।

যতদিন স্বামী জীবিত ছিলেন, বিন্দুবাসিনী ততদিন নিজের

দায়িত্ব বুঝিতে পারেন নাই। এখন বুঝিলেন। অতি কষ্টে, তাহার দিন চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ অন্নাভাব উপস্থিত হইল।

কেন এমন হইল, তাহা এইবার খুলিয়া বলিব। অজন্মা সুজন্মা চিরকালই আছে। একবার খুব বৃষ্টি হইল। ধানের ক্ষেত ডুবিয়া শস্য নষ্ট হইল। আবার ঠিক পরের বৎসরে, বৃষ্টি না হওয়ায় একই ফলই দাঁড়াইল। তাহার উপর ভাগের চাষ। দুই বৎসরের পরিশ্রম জলসই হইল দেখিয়া, ভাগীদার কৃষাণেরা আর চাষ করিতে স্বীকৃত হইল না। কাজেই বৃদ্ধা বড়ই কষ্টে পড়িলেন।

দিন ক্রমশঃ অচল হইল। বাঙ্গালীর ঘরের বিধবা তিনি, তাঁহার নিজের পেটের জন্য ভাবনা নাই। এক বেলা এক মুষ্টি সিদ্ধ আতপান্ন হইলেই চলে। ঘরের আনাচে কানাচে, দুটো নটেশাক্, উচ্ছে বেগুনও হয়। সুতরাং বৃদ্ধার দিন চলার কোন কষ্টই হয় না।

কিন্তু বিন্দুবাসিনী, মেয়ের কষ্ট দেখিয়া, বড়ই মুস্‌ড়াইয়া গেলেন। এক মাত্র আদরের মেয়ে কমলা যে তাঁর। সে ত উপযুক্ত আহার পায় না। ভাল মন্দ জিনিষটা খাইতে পায় না। অপর লোকের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীতে, শাশুড়ীর আদরযত্নের মধ্যে থাকিয়া, অনেক সময় পিতৃগৃহের কষ্ট ভুলিয়া যায়। কিন্তু কমলার ত সে উপায় নাই।

কুলীন জামাতা ডুমুরের ফুলের মত। তাহার দর্শন লাভও খুব অসম্ভব। স্বামীর আত্মকৃত্যের সময়, বিধবা লোক পাঠাইয়া অনেক করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—"বাবা! এ বিপদে একবার আসিয়া দাঁড়াইও।" কিন্তু কুলীন জামাতা গোপাল আসেন নাই। কেন তিনিই জানেন। বিন্দুবাসিনীর এ দুঃখ রাখিবার স্থান ছিল না।

সে.প্রায় দুই বৎসরের কথা। স্বামীর মৃত্যুর পর, বিধবা কষ্টে-শ্রেষ্ঠে, দুইটী বৎসর কাটাইয়াছেন। কিন্তু যে সময়ে এই মহা কষ্ট উপস্থিত হইল, তখন তাহার প্রতিকারের কোন উপায়ই নাই।

রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের খুল্লতাতপুত্র, প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। লোকে তাহাকে কুন্দগাঁয়ের জমিদার বলিত। প্রসন্নকুমার স্বনামধন্য পুরুষ। কারণ যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি তিনি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সবই নিজের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে।

প্রসন্নকুমার রমানাথের অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন। এজন্য তিনি রমানাথকে দাদা বলিতেন। রমানাথ নিজের স্বভাব গুণে গ্রামপূজ্য হইয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশের প্রসন্নকুমার, গুণের মর্য্যাদা মানীর মান রাখিতে জানিতেন। কাজেই তিনি রমানাথকে জ্যেষ্ঠের চেয়েও সম্মান করিতেন। অনেক সময়ে, তাঁহার রমানাথ দাদার বুদ্ধি লইয়া কাজ করিয়া, তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য তিনিও রমানাথের পরামর্শ না লইয়া কোন বড় কাজে হাত দিতেন না।

প্রসন্নকুমারের নগদ টাকা খুববেশী ছিল না। তবে তিনি ৫নং লাটের মালিক ছিলেন। গ্রামের মধ্যে অধিকাংশ জমিই তাঁর। বাগান বাগিচাও যথেষ্ট। বাড়ীখানি দ্বিতল ও দুই মহল। বৎসরান্তে একবার খুব সমারোহ করিয়া দুর্গোৎসব হইত। তাহা ছাড়া, আরও ছোট ছোট ক্রিয়াকলাপ যে না হইত, এমন নয়।

রমানাথের অকালমৃত্যুতে, এই প্রসন্নকুমার বড়ই মর্ম্মাহত

হইলেন। কিন্তু যমের উপর কাহারও ত হাত নাই। তিনি ভাবিলেন, যেন তাঁহার ডান হাতখানি খসিয়া গিয়াছে।

রমানাথের শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে, প্রসন্নকুমার তাঁহার এই ভ্রাতৃজায়া বিন্দুবাসিনীকে বলিলেন "বধূঠাকুরাণি! দাদার একটা মানসম্ভ্রম এ গ্রামের মধ্যে ছিল। তুমি যা বলিলে তাহাতে বুঝিতেছি—তিনি দেনা রাখিয়া গিয়াছেন। তা আমি না হয় তাঁর দেনাটা শোধ করিয়া দিব। আর তাঁর শ্রাদ্ধটা যাহাতে জাঁকাইয়া হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে আমি ইচ্ছা করি।"

রমানাথ বড় তেজস্বী লোক ছিলেন। নূতন ধনী প্রসন্নকুমারের বৈঠকখানায়, অনেক তর্কালঙ্কার, ন্যায়বাগীশ, ঘোষজা, বোসজা, দত্তজা তামাক পুড়াইতে আর দাবা খেলিতে যাইতেন। কিন্তু দরিদ্র রমানাথ কখনও তাঁহার ধনী খুল্লতাত পুত্রের বৈঠকখানায় এভাবে উপস্থিত থাকিতেন না।

রমানাথের পত্নীও সেইরূপ তেজদৃপ্তা। সুতরাং প্রসন্নকুমারের এই প্রস্তাব শুনিয়া, বিধবা বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"ঠাকুর পো! তোমার আরও বাড়্‌বাড়ন্ত হোক্। তিনি যে বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই, তাঁর দেনা শোধ হইবে। সংসার ত দুইটা পেট লইয়া। তা—ভগবান একরকমে চালাইয়া দিবেন। তবে তাঁর পরকালের কাজটা যাহাতে ভাল রকম হয়—সেটার ব্যবস্থা তুমি করিয়া দাও। আমি তোমাকে তিনশত টাকা দিতেছি।"

ধনী প্রসন্নকুমার, রমানাথ ও তাঁহার পত্নীকে চিনিতেন। এজন্য তাঁহার অভিমতের বিরুদ্ধে, কোন কাজ করিতে পারিলেন

না। তবে শ্রাদ্ধটা সম্বন্ধে, তিনি এমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহাতে লোকে খুব ধন্যধন্য করিয়াছিল।

প্রসন্নকুমারের প্রাণ অতি সাদা। কমলার বরপুত্র তিনি, কিন্তু বাণীর কৃপাও তাঁহার উপর যথেষ্ট ছিল। তিনি পরোপকারী ও ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্ববিহীন। জ্যেষ্ঠ রমানাথের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইয়া গেলেও, তিনি অবসর পাইলেই, মধ্যে মধ্যে তাঁহার বধূঠাকুরাণী বিন্দুবাসিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলাকে দেখিয়া যাইতেন। কিন্তু রমানাথের ব্রাহ্মণী বিন্দুবাসিনী, এতটা চাপা, যে সুচতুর প্রসন্নকুমার কিছুতেই ধরিতে পারিতেন না, যে তাঁহাদের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

বহুবার প্রসন্নকুমার তাঁহার ভ্রাতৃজায়াকে তাঁহার নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য, একটা আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিন্দুবাসিনী, তাঁহার সেই উদার প্রস্তাবে কোন মনোযোগই দেন নাই। যখন প্রসন্নকুমার পুনরায় এ সম্বন্ধে অনুরোধ করিলেন—তখন বিধবা বলিলেন,—"ঠাকুর পো! যখন কোন উপায়ে দিন চলিয়া যাইতেছে, তখন কেন বৃথা তোমার গলগ্রহ হই? তবে তিনি স্বর্গবাসী গিয়াছেন। তুমিই আমার কমলার অভিভাবক। গোপাল অনেক দিন এ বাড়ী-মুখো হয় নাই। যদি তাহাকে একবার আনাইতে পার ত বড়ই ভাল হয়।"

প্রসন্নকুমার মনে মনে জানিতেন, কেন এই বিধবা তাঁহার আশ্রয়ে যাইতে অসম্মত। তাঁহার দুর্ব্বিনীতা মুখরা পত্নী বিরজাই যে এই ব্যাপারের প্রধান অন্তরায়, তাহা জানিয়া তিনি এসম্বন্ধে বিন্দুবাসিনীকে আর কোন অনুরোধ করিতেন না।

প্রসন্নকুমার ধনী হইলে কি হয়, গ্রামের মধ্যে সবার অগ্রণী হইলে কি হয়, তাঁহার সংসারের সুখ একটুও ছিল না। কেন তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

যাই হোক, এই ভাবে পূর্ণ দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল। যে জন্মের মত সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সে তো আর দেখিতে আসে না, যে তাহার স্ত্রীপুত্রের কেমন ভাবে দিন চলিতেছে। তবে এ সহায়হীন অবস্থায়, দুঃখের দিনে. বিপত্তিকালে. দেখিবার কর্ত্তা সেই মধুসূদন।

এখন রমানাথের বিধবার সত্যসত্যই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ধানের মরাই একেবারে শূন্য। পেটিকার অর্থপূর্ণ থলিয়া শূন্য। বাড়ীতে এমন একখানিও সোনার গহনা নাই, যে বাঁধা দিয়া দু'দশ দিন চলে। তবে তৈজস যা দুই দশ খানা ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কষ্টেশ্রেষ্ঠে দিন চলিতেছিল।

বিন্দুবাসিনী নিজের জন্য একটুও ভাবিতেন না। ভাবনা তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা কমলার জন্য। প্রস্ফুটযৌবনোন্মুখী প্রোদ্ভিন্ন-কমলবৎ কমলা, স্বামী থাকিতেও স্বামীবিহীনার মত, মনের দুঃখে দিন কাটাইতেছে। কেন না তাহার স্বামী কুলীন-শ্রেষ্ঠ, ফুলের মুখুটী। তাঁহার দর্শন লাভ করা, অনেক ভাগ্যের কথা! হায়! বল্লাল! হায়! দেবীবর!

কুলীন হইয়া কুলীনের নিন্দা করিতেছি, পাঠক ইহাতে বোধ হয় গ্রন্থকারের উপর বিরক্ত হইবেন কিন্তু। বল্লাল বিধানে—

আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং

নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্—

প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণগুলি, যে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া এখন কেবল গজভুক্তকপিত্থবৎ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এখন যেমন পাশের ডিক্রীর অনুসারে পাত্রের দাম চড়ে, তখন সেইরূপ বড় কুলীনের বংশধর হইলে, পাত্রের দর চড়িত। আমাদের গোপালচন্দ্র, যিনি এই কমলার স্বামী, তিনি আজকালকার পাশের মাপকাটির হিসাবে এম-এ, ডিক্রীধারী কুলীন। এইজন্য তাহার মর্য্যাদা বেশী—গৌরব বেশী।

যাই হোক, বিন্দুবাসিনীর যত ভাবনা কন্যার জন্য। হাঁড়িতে চাল নাই, তাহা তিনি জানেন। কয়দিন ধার করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু আর চলে না। কেহ যে ধার দেয় না, তাহা নয়। তবে ধার চাহিতে ইচ্ছা করে না। বড় লজ্জা করে। যার একদিন মরাই ভরা ধান ছিল, যে গরীবদুঃখীকে রেকভরা চাউল দিয়াছে, আজ তার পত্নী হইয়া, কি করিয়া পাড়াপ্রতিবাসীর কাছে পেটের দায়ে চাল ধার করিবেন, এই ভাবিয়াই বিন্দুবাসিনী বড় কাতরা হইয়া উঠিলেন।

কমলা মায়ের মনের অবস্থা জানিত। সে যথাসম্ভব চাল কম লইত। মাতার জন্য প্রচুর পরিমাণে অন্ন রাখিয়া, মার পাতে বসিত। কোন কোন দিন নিজে আধপেটা খাইত। এই ভাবেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল।

কমলা মনে মনে ভাবিত, "আমার অভাব কিসের? স্বামীর

গৃহে স্থান পাইলে ত আমার সুখে দিন কাটিয়া যায়। কিন্তু কোথায় আমার স্বামী! আমি আমার ছয় ছয়টা সতীনের দাসীরূপেও যে তাঁর বাড়ীতে থাকিতে প্রস্তুত। তবুও তিনি আমাকে লইয়া যান না কেন? আমার দিকে ফিরিয়া চাহেন না কেন?"

এই সব কথা ভাবিয়া যুবতী কমলা, একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড টলিয়া যাইত না, পাষাণ প্রাণ কুলীন স্বামী গোপালের হৃদয়েও একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত না।

কান্তিময়ী কমলা, চুল বাঁধিত না। বেশ ভূষা করিত না। গভীর বনান্তরালে পত্রাচ্ছাদনে লুক্কায়িত, গন্ধভরা-বনকুসুমের মত, সে আপনা আপনি নির্জ্জনে অনাদরে শুখাইতেছিল। একে স্বামী সাহচর্য্যের অভাবনিবন্ধন এই মর্ম্মন্তুদ জ্বলা, তাহার উপর অন্নকষ্ট। চিরপ্রফুল্লমুখী স্নেহশালিনী মায়ের কষ্ট দেখিলে, সে বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়ে।

কমলা আর কি করিবে? দেশ ও সমাজকে সে মনে মনে অভিসম্পাত করিত। দেবতাকে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ডাকিয়া, তাহার মনোবেদনা পরিজ্ঞাপন করিত। আর গভীর নিশীথে, মর্ম্মজ্বালা সহিতে না পারিয়া, অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিয়া, সে বালিশ ভিজাইত! হায় কৌলীন্য! হায় কুলীন জামাই!

একদিন কমলা সকালে উঠিয়া, ঘরদ্বার আঙ্গিনা পরিষ্কার করিয়া, বাসন মাজিয়া, স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া, রান্নার আয়োজন করিতে গেল। দেখিল, হাঁড়িতে যে চালগুলি আছে, তাহাতে এক জনের কুলাইতে পারে। সে মনে মনে ভাবিল—মার খাওয়া হইলেই

হইল। আমার না হ'লে আসে যায় কি? যখন সব সহিতে শিখিয়াছি, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালাটা সহ্য করিতে পারিব নাই বা কেন? তা হলে যে আমার হিন্দুর ঘরে, বামনের ঘরে জন্মানই বৃথা হইয়াছে।

সে দিনটা কমলা কোন রকমে চালাইয়া দিল। কিন্তু চালের হাঁড়িতে একটী দানামাত্র চাল যে নাই। কাল চলিবে কিরূপে?

পেট ভার বলিয়া, কমলা সে দিন কিছুই খাইল না। পাশের বাড়ীর এক কৈবর্ত্তের মেয়ে, রেকখানেক মুড়ি দিয়া গিয়াছিল। সে মাঝে মাঝে কমলাকে প্রায়ই এইরূপ স্নেহোপহার দিত। কেননা কমলার পিতার নিকট, তাহার স্বামী বড়ই ঋণী। কমলার সেবা যত্নে, তাহার শিশু পুত্রটী প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। কমলা অন্নাভাবে সেদিন মুড়ি খাইয়া কাটাইল।

দুঃখের রাত পোহাইতে বাকী থাকে না। সুখী দুঃখী সবারই রাত পোহায়। কমলাদেরও রাত পোহাইল। কিন্তু রজনী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রধান ভাবনা, একটীও চাল যে নাই! তাহার মা কি আজ তাহাহইলে উপোষ করিয়া থাকিবেন?

বেলা নয়টা বাজিয়া গেল। কমলা তখনও রান্না ঘরে যায় নাই দেখিয়া, বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"হা মা কমলা! রান্না চড়ালে না যে?"

"কি দিয়ে রান্না চড়াবো মা!" বলিয়া কমলা নিরাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে, তাহার মায়ের মুখের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পটল-চেরা চোখ দুটী জলে ভরিয়া উঠিল।

বিন্দুবাসিনী কন্যার চক্ষে জল দেখিয়া, সবই বুঝিলেন। বলিলেন, "তা চাল নাই আমায় বলিস নি কেন ?

কমলা। তুমি তা হ'লে কি কর্ত্তে মা ?

বিন্দু। কারুর কাছে না হয় ধার করে আনতুম।

কমলা। ছি! ছি!

বিন্দু। তা হলে ও বাড়ীর ঠাকুর পোকে ডেকে পাঠাবো কি ?

কমলা। না—তা করো না। মনে রেখো, আমার পিতা মহা তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। জীবদ্দশায়, তিনি তাঁর ধনী জ্ঞাতির কাছ থেকে, কখনও কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন নি। ভুলে যেওনা মা! তুমি সেই মহাতেজস্বী রমানাথ চাটুয্যের পরিবার।

বিন্দু। তবে কি না খেয়ে আমরা মরবো! আমার জন্য ভাবি নি। তোমার জন্যই ভাবছি।

কমলা। আমার ত ভাতের অভাব নেই। পাঠিয়ে—দাও না।

খুব সাহসে বুক বাঁধিয়া কমলা বলিল—"পাঠিয়ে—দাও না।" বিন্দুবাসিনীর চোখে এই কথায় জল আসিল। চোখ মুছিয়া বলিলেন—"হা! নারায়ণ! আমার কি সেই কপাল! কোথায় তুমি যাবে? সেকি একটা মানুষ!"

কমলা আর কিছু বলিল না। কথাটা একাবারে চাপিয়া গেল। এমন সময়ে সেইখানে পাড়ার রুদ্রপিসি আসিয়া দেখা দিলেন। কাজেই মা ও মেয়ে দুইজনেই মুখ বুজিল।

(৩)

রুদ্র পিসি দালানে উঠিয়াই বলিলেন—"কি বৌ! এখনও যে রান্না চড়াও নি?"

কমলা বলিল—"মার আজ একটু জ্বরভাব হয়েছে। আমার ও শরীরটা তত ভাল নয় পিসি মা। আর তার উপর আজ আবার পূর্ণিমা। আজকের দিন্‌টে জলটল খেয়ে কাটাবো।"

এই কথা শুনিয়া রুদ্র পিসি একটু হাসিলেন। কমলা সে হাসি দেখিতে পাইয়া, একটু ভয় পাইল। হাসিটা বিদ্রুপের কি সহানুভূতির, কিছুই সে ঠিক করিতে পারিল না।

রুদ্রপিসির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহার আদত নাম—রুদ্রাণী। সেকালের নাম এই রূপই হইত। রুদ্রাণী, বাল-বিধবা। যখন তিনি নয় বৎসরের, তখন তাঁহার হাতের নোয়া খসিয়াছে। তাঁহার পিতার গৌরীদানের ফল ফলিয়াছে!

কলহ-বিদ্যায় যদি উপাধি থাকিত, তাহা হইলে রুদ্রাণী ঠাকুরাণী, কলহের "প্রেমচাঁদ—রায়চাঁদ স্কলার"। তাঁহার মত কলহ-শব্দশাস্ত্রে অধিকার, সে পাড়ায় আর কাহারও ছিল না। কলহসম্বন্ধে তাঁহার এই সার্ব্বভৌমিকত্ব জন্য, কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে বা তাঁহার মুখের উপর কোন কথা বলিতে সাহস পাইত না।

পরের ছিদ্রান্বেষণে, তিনি সর্ব্বদাই সিদ্ধহস্তা। এর কথা ওকে লাগানো, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি। এই ভাবে কলহ বাধাইয়া দিয়া, মজা দেখিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। আর যে পক্ষে

তিনি যোগ দিতেন, সেই পক্ষ—পাণ্ডবপক্ষে দাঁড়াইত। অর্থাৎ সে পক্ষ জয়লাভ করিত।

কাহারও মাচায় লাউ ঝুলিতে দেখিলে, তাঁহার অলাবু ভক্ষণের প্রবল ইচ্ছা জন্মিত। রুদ্রাণী তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া, সেই গাছে দোদুল্যমান অলাবুর অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিতেন, "এমন লাউ বাবু খুব কম লোকের গাছে হতে দেখেছি।" প্রশংসাবিমুগ্ধা গৃহস্বামিনী, অগত্যা একটী লাউ কাটিয়া পিসিকে উপহার দিতেন। পিসিও হাসিমুখে আশির্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

রুদ্রপিসি এইরূপে পাড়ার মধ্য হইতে (অবশ্য বামুন-কায়েতের বাড়ী) চালটা, ডালটা, লাউটা, কুমড়াটা, শাকটা সবজীটা সংগ্রহ করিতেন। তাহাতেই তাঁহার দিন চলিয়া যাইত।

পাড়ার মধ্যে একটা গুজব প্রচারিত ছিল—সে রুদ্রাপসির কিছু যক্ষের ধন আছে। তাঁহার এক ভাসুর-পো, খুব বড় চাকরী করে। সেই তাঁহাকে নাকি প্রতিমাসে পাঁচটী করিয়া টাকা দেয়। তখন মনিঅর্ডারের প্রচলন হয় নাই। সুতরাং এ টাকা কোথা দিয়া কি করিয়া আসিত, তাহার রহস্য; পিসিমাই জানিতেন। তবে দু'একশ টাকা যে তিনি তেজারতিতে খাটাইতেন, গহনা বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার দিতেন, এটা পাড়ার লোকে জানত।

রুদ্রপিসি ডাকসাইটে—পিসিমা। পাড়ার সকলেই তাঁহাকে 'পিসিমা' বলিয়া ডাকিত। আর তিনি তাঁহার এই বিশ্বজনীন পিসিত্বের জন্য, বিশেষ কোন বিরক্তি বোধ করিতেন না।

কাহারও ঘরে হয়তো বন্ধ্যা পুত্রবধুর একটীও ছেলে হইল না।

পুত্রাভাবে বংশরক্ষা হইতেছে না দেখিয়া, বাড়ীর গৃহিণীঠাকুরাণীর বড়ই মনোকষ্ট। তিনি এক টাকা খরচ করিয়া রুদ্রপিসির নিকট হইতে বন্ধ্যাত্ব-মোচনের ঔষধ লইয়া গেলেন। কাকতালীয়বৎ, রুদ্রপিসির হাতের কিম্বা ভাগ্যের গুণে, সে ঔষধটা খাটিয়া গেল। সেই বধূমাতাটি যথাসময়ে একটী সন্তানপ্রসব করিলেন। আর রুদ্র-পিসি এজন্য নগদ দুইটী টাকা বাবাঠাকুরের পূজার জন্য পাইলেন।

ইহা ছাড়া, মোকদ্দমা-জয়ের ঔষধ, রক্তামাশয় ও পুরাতন জ্বরের মহৌষধ, আধকপালে ও বাধকের অব্যর্থ ঔষধ ও তুক্‌তাকের গুণ্‌গানের উপকরণাদি, রুদ্রপিসির মেডিক্যাল-বিভাগে সঞ্চিত থাকিত। পূজার পয়সা ফেল—আর ঔষধ লইয়া যাও। এই সব ব্যবসা, রুদ্রপিসির অর্থাগমের একটা বিশেষ উপায় ছিল।

রুদ্রপিসির আরও কি কি গুণ ছিল, তাহা আমরা এখন বলিব না। এই আখ্যায়িকার যথাস্থানে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

এ হেন অঘটনঘটনপটীয়সী রুদ্রপিসি যখন দেখিলেন—যে বেলা দশটা বাজে, তখনও কমলাদের বাড়ী হাঁড়ি চড়ে নাই, আর তাহারা একটা বাজে অছিলা করিয়া, উপোসের ব্যবস্থা করিতেছে, তখন তিনি বড়ই সন্দিগ্ধ হইলেন। আড়ালে আবডালে থাকিয়া লোকের গুপ্তকথা শোনা, তাহার একটা ভয়ানক ব্যাধি ছিল। কমলাদের বাড়ীতে প্রবেশের আগে—"হাঁড়িতে যে একটীও চাল নাই" এ কথাগুলি তাঁহার কাণে গিয়াছিল। কাজেই গোল বাধিল।

রুদ্রপিসি. বিন্দুবাসিনীকে খুব একটা সহানুভূতি জানাইয়া বলিলেন—"হাঁ বৌ! আমি কি তোদের পর? রমানাথ (কমলার পিতা) যখন ছিল, সে আমার কাছে কোন কথাই গোপন করতো না। আমি বুঝেছি, তোদের কি হাল হয়েছে। তা এমন করে ক'দিন চলবে বৌ?"

বিন্দুবাসিনী সাদাসিদে লোক। কথার মার পেঁচ জানেন না। তিনি রুদ্রপিসির এই কথা হইতে বুঝিলেন—যে পিসি তাঁহাদের কতক কথা শুনিয়াছে। এখন এসব কথা চাপিবার চেষ্টা করিলে একটা মহা বিভ্রাট ঘটিবে। একঘণ্টা অতীত না হইতে হইতে এই রুদ্রপিসির মুখেই, কথাটা চারিদিকে সালঙ্কারে ছড়াইয়া পড়িবে। এজন্য বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"তোমার কাছে, মিথ্যে কথা বলবো না দিদি! আজ সত্যই আমার শরীরটা ভাল নয়। এজন্য কিছু খাবো না। তবে আজ কাল আমাদের সংসার একটু কসাকসির মধ্যেই চলছে। বাগানখানা জমা দেবার জন্য এত চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু একটাও সুবিধামত প্রজা পাচ্ছি না।

রুদ্রপিসি বলিলেন—"তা এক কাজ করনা বৌ। যখন যেমন তখন তেমন, এই ভাবেই ত সংসারে চলতে হয়। তোমার জ্ঞাতি পেসন্নর ত এখন খুব বাড়বাড়ন্ত সময়। সেতো তোমাদের আপনার লোক। তোমরা দিনকতক না হয় তার বাড়ীতে গিয়ে থাক না। প্রসন্নকে বলতে তোমাদের লজ্জা হয়, আমিই না হয় তা'কে বলি।"

বিন্দুবাসিনী, রুদ্রপিসির এই সহানুভূতিতে বড়ই ভয় পাইলেন। এত দিন তিনি মুখ বুঝিয়া কাহাকেও না জানাইয়া, দুঃখভোগ করিয়া

আসিয়াছেন। তাহার ইচ্ছা হইলে, তিনি নিজেই তাঁহার প্রসন্ন-ঠাকুরপোকে এ কথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু এ ব্যাপারের মধ্যে রুদ্রপিসি আসিয়া পড়ায়, বড়ই গোলমালে দাঁড়াইতেছে।

কিন্তু রুদ্রপিসি যখন ভিতরের কতক কথা জানিতে পারিয়াছে, তখন তাহাকে নিবৃত্ত করিতে গেলেই, সে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত করিবে। এ জন্য তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"এমন দশা যেন শত্রুর না হয় দিদি! কখনও কারুর দ্বারস্থ হইনি। এই বুড়ো বয়সে সোমত্ত মেয়ে নিয়ে, এখন কেমন করে পরের দ্বারস্থ হই বল দেখি?"

পিসি ঠাকুরাণী বলিলেন—"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ত! তা আর এতে লজ্জাই বা কি? জামাই যদি কমলাকে নিয়ে যায়, তাহলে তোর ঝঞ্ঝাটই বা কি বৌ? তা কাউকে দিয়ে জামাইকে না হয় একখানা চিঠি পাঠিয়ে দে! আর আমিও পেসন্নর সঙ্গে দেখা করে, তাকে কথাগুলি গুছিয়ে বলি গে। এ সময়ে মুখ বুঝে চুপ করে থাক্‌লে, দেহের কষ্ট, মনের কষ্ট। আর পেসন্ন হচ্ছে রমানাথের আপনার খুড়তুতো ভাই। এই ভিটেই ত ওদের আদ ভিটে। এখন না হয় পেসন্নর অবস্থা খুব ভাল হয়েছে—আলাদা বাড়ী ঘর দোর করেছে। আপনার জনকে দুঃখের কথা বল্‌তে দোষ কিছু ত নেই। তা কি বলিস্—বল্‌বো?"

প্রসন্নকুমারের সহিত পাঠকের পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছে। তিনি একজন জমীদার লোক। তাঁহার খুল্লতাত পুত্র রমানাথকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। রমানাথ তাঁহার অগ্রজ। এজন্য

জ্যেষ্ঠ সহোদরের সম্মান, তিনি বরাবরই তাঁহার কাছে পাইয়া আসিয়াছেন। তবে ভয় কেবল—বিরজাকে।

প্রসন্নকুমারের ঘর-সংসারের কথা যখন আমরা বলিব, তখন এই বিরজার সম্বন্ধে অনেক কথাই প্রকাশ পাইবে।

বিন্দুবাসিনী এই বিরজাকে খুব ভালরূপই জানিতেন। এজন্য প্রসন্নকুমারের সংসারে যাইতে তাঁহার একটুও ইচ্ছা ছিল না।

প্রসন্নকুমার ইতিপূর্ব্বে, অর্থাৎ রমানাথের শ্রাদ্ধশান্তির পর একদিন বলিয়াছিলেন—"বড় বৌ! তুমি আমার মার মতন। আমার বাড়ীতে চল, সেখানে আমি তোমাদের আলাদা বন্দোবস্ত করে দোব। আর তোমাকে গুরুর আদরে রাখবো।"

তাহার উত্তরে বিন্দুবাসিনী তখন বলিয়াছিলেন—"ঠাকুরপো! তোমার আশ্রয়ে গিয়ে থাক্‌বো, তাতে আর লজ্জার কথা কি? কিন্তু স্বামীর ভিটেয় তা হলে যে সন্ধ্যে পড়বে না। তাঁর আদেশ ছিল—হাজার কষ্ট পাও যদি, আমার পৈত্রিক ভিটে ত্যাগ করো না। তা তুমি যখন বলছো, তখন এ টুকু বল্‌তে পারি—যদি কখনো তোমার বাড়ীতে যাবার প্রয়োজন আমাদের হয়, আমি নিজেই তোমাকে জানাবো।"

কিন্তু বিন্দুবাসিনী, তাঁহার এই দুরবস্থার সময়েও তাঁহার ঠাকুর পো, জমীদার প্রসন্নবাবুকে, এ কথা জানাইতে সাহস করেন নাই। তাহার মনে অনেক সময় এ সম্বন্ধে একটা ইচ্ছা জাগিয়া উঠিত বটে, কিন্তু লজ্জা যেন সে ইচ্ছাটাকে খুব জোরে চাপিয়া ধরিত।

কিন্তু লজ্জা যাহা এতদিন জোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিল,

সে কথা আজ না হয় কাল, প্রসন্নকুমারের কাণে পৌঁছিবেই পৌঁছিবে। যখন শ্রীমতী রুদ্রাণী দেবীর, সতর্ক শ্রুতিযুগলে তাঁহাদের এই দুঃখের কথা পৌঁছিয়াছে, তখন সহস্রবার নিষেধ করিলেও তাহা প্রসন্নবাবুর কাণে উঠিবেই উঠিবে।

রুদ্রপিসি চলিয়া গেলে, কমলা তাহার মাকে বলিল—"মা! মানুষে মনে যা ভাবে তা কি হয়?"

মাতা বলিলেন—"তা হয় না বটে! কিন্তু কেন এ তুমি কথা বল্‌ছো মা?"

কমলা। রুদ্রপিসি যখন আমাদের ঘরের কথা জান্‌তে পেরেছে, তখন ও বাড়ীর কাকাবাবু নিশ্চয়ই এ খপব পাবেন। তাঁর যেমন উঁচু মন, তিনি আমাদের যেমন ভালবাসেন, খপরটা পেলেই তিনি দৌড়ে আসবেন।

বিন্দু। তা তুমি যদি যাও, তা হলে আমিও যেতে রাজি। তোমাব জন্তই ত আমার এ কষ্ট মা।

কমলা। আমার আর কোন অমতই নেই। বিশেষতঃ অপর্ণা যখন ও বাড়ীতে আছে, তখন আমার যেতে খুবই ইচ্ছে হয়। তবে ভয় হয় ও বাড়ীর খুড়ীমাকে।

বিন্দু। আমারও সেই ভয় কমলা। ওখানে গেলে কি আমরা টিক্‌তে পারবো?

কমলা! একটা কাজ কল্লে হয় না?

বিন্দু। কি কাজ?

কমলা। এখনও ত আমাদের পাঁচ বিঘে এক খানা বাগান

র'য়েছে। তুমি ও বাড়ীর কাকাবাবুকে বলো, তিনি যেন আমাদের ও বাগান্ খানা কিনে নেন। তা হলে ত তুমি চার পাঁচশো পাবে। এ টাকাটা পেলে, তোমার আর আমার খুব স্বচ্ছন্দে অনেক দিন চলে যাবে। একটা ছেলে পুলে নেই, তোমার। থাক্‌বার মধ্যে আছি, এক অভাগী কন্যা আমি। ভাবনা কি তোমার মা!

বিন্দুবাসিনী মেয়ের কথাগুলি শুনিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"পোড়া পেটের জন্য, আর মানসম্ভ্রমের দায়ে দেখ্‌ছি, শেষ তাই কর্ত্তে হবে। তা এ অবস্থায় এ ভিন্ন ত আর কোন উপায় দেখ্‌ছি না মা। যা করেন, সেই মধুসূদন নারায়ণ।"

মাতা ও কন্যার সাহচর্য্য ছাড়িয়া এইবার আমাদিগকে একবার প্রসন্নকুমারের অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে হইবে।

(৪)

প্রসন্নকুমার ধনী জমীদার। বন্দীপুরের লাট কিনিয়া তিনি একবারে ফাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রিয়াকলাপও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মনের সুখ শান্তি তেমন একটা ছিল না। কেন—তাহা একবার আমাদের খুঁজিয়া বলিতে হইবে।

বিরজাসুন্দরী প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। কিন্তু সে তাঁহার বেশী বয়সের দ্বিতীয় পক্ষ নহে। বিরজার রূপ ছিল—সে রূপে মোহ আসিত। বিরজা সুন্দরী, যখন রূপের প্রভায় প্রসন্নকুমারের কক্ষগুলি উজ্জল করিয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া

বেড়াইত, অন্তরাল হইতে সেই রূপের মধুর বিকাশ দেখিয়া, রূপমুগ্ধ প্রসন্নকুমার, উজ্জ্বল বহ্নিসম্মুখস্থ পতঙ্গের মত মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন।

কিন্তু রূপ থাকিলে কি হয়, বিরজাতে গুণ খুব কমই ছিল। বিরজা দু'চক্ষে পরকে দেখিতে পারিত না। তাহার মুখের রূক্ষ কথা শুনিলে, লোকে হাড়েহাড়ে জ্বলিয়া যাইত। সে গরীবের ঘরের রূপসী কন্যা। এজন্য তাহার মনে, জমীদারের পত্নী বলিয়া একটা দর্পও জন্মিয়াছিল।

এই দ্বিতীয় পক্ষের মুখরা পত্নী লইয়া, শান্তিপ্রিয় প্রসন্নকুমার একটা ঘোর অশান্তির মধ্যে জীবনের দিনগুলি কাটাইতে ছিলেন। এ অশান্তির কারণ একাই যে বিরজা, তাহা নয়। বিরজার মাতা ও ছোট ভাইটীও এই অসাচ্ছন্দের অব্যবহিত হেতু।

কি করিয়া প্রসন্নকুমারের শ্বশ্রূঠাকুরাণী সেই বাড়ীতে আসিলেন, তাহার একটী ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। তখনকার কালে জামাই বাড়ীতে সহসা কেহ আসিতে বা থাকিতে চাহিত না। তবে যে প্রসন্নকুমারের শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিলেন—তাহা কেবল অভাবের তাড়নায় ও পেটের দায়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রসন্নকুমার এক গোত্রহীন লোকের রূপসী কন্যাকে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার এত উন্নতি হয় নাই। কিন্তু এই রূপসী বিরজা তাঁহার গৃহে আসিবার চারি-বৎসর পরে, তাঁহার সৌভাগ্যের মূল তালুকখানি তিনি খরিদ করেন

অনেক প্রেমমুগ্ধ, রূপমুগ্ধ স্বামী, কোন ব্যাপারে প্রচুর লাভবান হইলে—পত্নীকে বলিয়া থাকেন,"তোমার পয়েই আমার এই হইল।" প্রসন্নকুমার অবশ্য ইহাঁদের দলছাড়া নহেন। বিরজার কর্ণকুহর, এই প্রকার প্রশংসার প্রতিধ্বনিতে, খুবই উত্তেজিত হইয়া উঠিত। তাহার মনে নারীর স্বভাবসুলভ একটা দর্প আসিল, যে আমাকে বিবাহ করিয়াই, আমার স্বামীর এই ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বিরজাসুন্দরী দুই ছেলের মা। তাহার একটী ছেলে একটী মেয়ে। আর তাহার ছিল এক সপত্নীকন্যা। তাহার নাম অপর্ণা।

অপর্ণার মাতা পরলোকে চলিয়া যাইবার পর, প্রসন্নকুমার বহুদিন বিপত্নীক অবস্থায় ছিলেন। অপর্ণার গর্ভধারিণী সুমতিদেবী বিরজার মত অত রূপবতী না হইলেও, অশেষ গুণবতী ছিলেন। ধরিতে গেলে—প্রসন্নকুমারের সৌভাগ্যের পত্তন, তাঁহার আমলেই হইয়াছিল। একটী আট বৎসরের টুক্‌টুকে মেয়ে, স্বামীর জিম্মায় রাখিয়া, সুগুণশালিনী সুমতি, ইহলোকের পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন।

তাহার পর দশবার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। প্রসন্নকুমার এই মাতৃহীনা কন্যার খুব জাঁকজমক করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। আর মেয়েটী পড়িয়াছিলও এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনীর ঘরে। কিন্তু ভাগ্য—অপর্ণার প্রতি বড়ই বিরূপ! কথাটা বলিতে আমাদের বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমাদের লিখিতেই হইবে। ভাগ্যবিড়ম্বনায়, বিবাহের চারিবৎসর পরে অপর্ণা বিধবা হইল।

বিরজার যতদিন ছেলে পুলে হয় নাই, ততদিন সে সপত্নীকন্যা অপর্ণাকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখিত। কিন্তু তাহার গর্ভজাত কন্যাটী যতই ডাগর হইতে লাগিল, ততই সে অপর্ণাকে স্নেহহীন চক্ষে দেখিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাতে আসে যায় কি? অপর্ণার স্বামীগৃহে ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। কলিকাতাবাসী এক ধনীলোকের পুত্রবধূ সে। কিন্তু অপর্ণা পিতার শান্তিময় পল্লীভবনে থাকিতে, বড় ভালবাসিত। ধরিতে গেলে বিরজা তাহার কোন ভারই লয় নাই। প্রসন্নকুমারের এক বিধবা ভগ্নী, অপর্ণার পিসিমাই, তাহার রক্ষয়িত্রী এবং পালয়িত্রী।

বিমাতা যে তাহাকে আন্তরিক ভালবাসে না, ইহা বুঝিয়াও অপর্ণা তাহা বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত না। সে তাহার নির্জ্জন কক্ষের মধ্যেই সময়ক্ষেপ করিতে ভাল বাসিত।

মধ্যে আর একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বিরজার পিতৃবিয়োগ বহুদিন হইয়াছিল। তারপর তাহার বিধবা মাতার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। মাতা একদিন বল্লা নাই কওয়া নাই, সহসা গোপনে আসিয়া কন্যাকে তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া গেলেন। প্রসন্নকুমার তখন তালুকে গিয়াছিলেন, কাজেই তিনি শাশুড়ীর আগমন সম্বন্ধে কোন কিছুই জানিতে পারিলেন না।

বিরজা তখন আসন্নপ্রসবা। তাহার প্রসবের পর, প্রতিবারেই যমে-মানুষে টানাটানি পড়ে। বিরজা স্বামীকে বলিল—“আমার মাকে এই সময়ে আনাও। এ সংকট সময়ে, আমার সেবাশুশ্রূষা

করে কে? শরীর বড়ই দুর্ব্বল। আমি বোধ হয়, এবার প্রাণে বাঁচিব না।"

প্রসন্নকুমার একবার পত্নী হারাইয়াছেন। আবার পাছে তাহার সেই অবস্থা ঘটে, এই আশঙ্কায়, তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও শশ্রুঠাকুরাণীকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, শ্বশ্রূর সঙ্গে তাহার শ্যালক রামপ্রসাদও ভগ্নিপতির বাটীতে পদার্পণ করিল।

মাতার যত্ন শুশ্রূষায়, বিরজা প্রসবের পর পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করিল। কিন্তু তাহার মাতা ও ভ্রাতা সেই বাড়ীতে রহিয়া গেল।

প্রসন্নকুমার দেখিলেন, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর শুভাগমনে সংসারে তাহার স্বাধীনতা ক্রমশঃ লোপ হইয়া পড়িতেছে। অনেক বিষয়েই তিনি হাত-পা-বাঁধা অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন।

এমন সাহস হয় না তাঁহার, যে তিনি পত্নীর কাছে এ সম্বন্ধে মনের ভাব প্রকাশ করেন কিম্বা তাহাকে বলেন—"আর কেন! এখন ত তুমি সারিয়াছ। উহাঁদের বাড়ী পাঠাইয়া দাও না কেন।" কিন্তু তাহা করিতে গেলে এমন একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, যাহা নিভানো, তাঁহার সেই সময়ের অবস্থায় বড়ই অসম্ভব।

প্রসন্নকুমার খুব রাশভারি লোক ছিলেন। এজন্য অনেকে তাঁহাকে ভয়ভক্তি করিয়া চলিত। কিন্তু অন্দরে আসিলেই, তাঁহার এ গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত ভাবটা, যেন লোপ হইয়া যাইত। তিনি সম্পূর্ণরূপে এক অসার অপদার্থ জুজু বনিয়া যাইতেন। একা প্রসন্নকুমার কেন,

এ সংসারে অনেক ঘর খুঁজিলে, এরূপ অনেক প্রসন্নকুমার বাহির হইয়া পড়িতে পারেন।

এইভাবে প্রসন্নকুমারের দিন চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এর মধ্যে আবার একটা নূতন কষ্টকর উপসর্গ উপস্থিত হইল। সেটা তাহার আদুরে শ্যালক রামপ্রসাদ।

ভগ্নিপতি জমিদার লোক। ভগ্নি হইতেছেন, গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। কাজেই ভগ্নিপতির আশ্রয়ে আসিয়া, রামপ্রসাদের নসীব খুলিয়া গেল। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, চাল-চুল সবই বিগ্‌ড়াইল। ভাতের পাতে এক ছটাক ঘি না হইলে, তার খাওয়া হয় না। দুধ ঘন করিয়া জাল দিয়া, সরপড়া অবস্থায় না দিলে, তাহার পাতে ভাত থাকিয়া যায়। মাছের মুড়াটা না চিবাইলে, তাহার মাথা ঘোরে। এই সব বদরোগ হইয়া পড়ায় প্রসন্নকুমার ভাবিলেন, এই আদুরে গোপাল সম্বন্ধির হাত হইতে কবে তিনি উদ্ধার পাইবেন?

রামপ্রসাদ দিনে দিনে শুক্লপক্ষের শশীকলার মত পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। বিরজার চেষ্টায়, তাহার জন্য একটা আলাদা বৈঠক-খানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দেওয়ান, কারকুন, নায়েব, গোমস্তা, ও বাড়ীর চাকর বাকরের নিকট রামপ্রসাদ এখন "মামাবাবু" বলিয়া পরিচিত। আর ভগ্নী ও মাতা আদর করিয়া তাহাকে "প্রসাদ" বলিয়া ডাকিতেন। আমরা এখন হইতে এই আদরের নাম 'প্রসাদই' ব্যবহার করিব।

প্রসাদ দেখিতে খুব সুপুরুষ। ভগ্নির ভাই তো! তাহার রংটা খুব উজ্জ্বল ছিল। মুখখানি আরও সুন্দর। গুণে, ভাই ভগ্নি একই

রকম। উভয়েই কুটিল, কুচক্রী, আত্মসন্তোষবিহীন, অল্পে রুষ্ট। ভগ্নিপতির বাড়ীর রাজভোগে, এই অপদার্থ নন্দদুলাল রাম-প্রসাদের দৈহিক কান্তিপুষ্টি এবং প্রসার বৃদ্ধি হইলেও, তাহার মা বলিতেন—"ও মা! বিরু! তোর ভাই দিন দিন অমন রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন?" বিরজা মায়ের এ ন্যাকামি সহিতে পারিত না। সে মুখ বুজিয়া থাকিত। কোন জবাব দিত না।

প্রসাদেব মাতা ঠাকুরাণী, একদিন কন্যা বিরজাসুন্দরীকে ধরিয়া বসিল—"তোমার ভায়ের একটা চাকরী করে দাও না মা। অমন রাজা জামাই আমার। এই অপোগণ্ড প্রসাদকে উনি যদি না দেখেন. তার একটা হিল্লে করে না দেন, তা হলে এর পর চিরদিনই ওঁকে এর ভার বইতে হবে।"

বিরজা মাতার উপদেশে, সেইদিন রাত্রেই স্বামীকে বলিল—"আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

প্রসন্নকুমার টাকাকড়ি বা কোন নূতন অলঙ্কারের বাহানায় পূর্ব্ব সূচনা অনুভবে বলিলেন—"তোমার কোন কথা না রাখি বিরজা?"

বিরজা একটু মুচ্‌কী হাসিয়া, প্রসন্নকুমারের হাত দুখানি ধরিয়া সোহাগের সুরে বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি। প্রসাদটার একটা চাকরী করে দাও।"

প্রসন্ন। তা—ও কি চাকরী করবে বল? ইংরাজী তেমন জানে না। সাহেব-সুবোর সঙ্গে কথাই কইতে পারবে না।

বিরজা। সাহেব সুবোর দরকার কি আমার! তুমি থাকতে

সাহেব? তোমার জমিদারীতে ওকে একটা নায়েবী কাজ করে দিলে আর তোমাকে ওর ভার বইতে হবে না। আর আপনার লোক ও বতটা টেনে সেরেস্তার কাজ করবে—তেমন কি আর কেউ পারবে! ও ব'সে ব'সে খায়, এতে আমার লজ্জা বোধ হয়।

প্রসন্ন। জমীদারী সেরেস্তার কাজ বড় শক্ত বিরজা! তাতে অনেক উপস্থিত বুদ্ধি চাই। কাচা পয়সার ব্যাপার! প্রসাদ লোভ সামলাতে পারবে কি? হিসেবী লোক না হ'লে, জমীদারীর কাজে পট্ করে জড়িয়ে পড়ে। ওর দ্বারা ও কাজ হতেই পারেনা?

বিরজা রাগ করিয়া, মুখ ঘুরাইয়া, চোখ্ রাঙ্গাইয়া বলিল "কেন হ'তে পারবে না? ও কি কখন টাকা চোখে দেখেনি! তোমার দিতে ইচ্ছা হয় দাও। না দাও—আমার কথা ঠেলে আমাকে অপমান কর, তা হলে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগবে। আজ আমি মার কাছে জাঁক করেছি, যেমন করে হোক্ ওঁকে বলে, রামপ্রসাদের চাকরী করে দোব। তা মায়ের কাছে যদি আমার মুখ না থাকে, তা হলে তার চেয়ে আর বেশী অপমান কি? আর আমার স্বামী হয়ে তুমি সেই অপমানটা দেখবে—কেমন? আমি জানি, এখন আমি তোমার দু'চোখের বিষ হয়েছি।"

প্রসন্নকুমার এ আক্ষেপোক্তিতে মনেমনে প্রমাদ গণিলেন। প্রসাদের চাকরী সম্বন্ধে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষ, বিরজাই চোখের জল ফেলিয়া বাজি জিতিল। শ্যালক-চূড়ামণি মূর্খ রামপ্রসাদ, নায়েবের কাজ পাইয়া মহলে চলিয়া গেল।

আমরা জানি, রামপ্রসাদের চাকরীতে শুভযাত্রার দিনে, বাড়ীতে

একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। রামপ্রসাদের মা—সুবচনীর হাঁস, সত্যনারায়ণের সিন্নি, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা, মানত করিলেন। রামপ্রসাদ যেন আলেকজাণ্ডারের মত দিগ্বিজয় করিতে চলিয়া গেল।

এই ভাবে সংসারের অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, প্রসন্নকুমার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি সুখী। কেননা তিনি সুন্দরী শ্রেষ্ঠা পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। সে পাড়ায় কাহারও অমন পরীর মত সুন্দরী ভার্য্যা ছিল না।

(৫)

রুদ্রপিসি হইতেছেন—পল্লী-গেজেট। যে সকল সংবাদ তাঁহার দপ্তরে নাই বা তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশ হইত না, তাহা সংবাদই নয়।

গঙ্গার ঘাটে এক দিন অনেক মহিলা স্নান করিতেছেন। কি একটা যোগ ছিল, তাই ভিড়টা একটু বেশী। বালিকা, কিশোরী, যুবতী, পৌঢ়া, বৃদ্ধা, সবাই সেদিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছে। কেহ স্নান করিতে জলে নামিতেছে, কেহ নামিয়া গা রগড়াইতেছে, কোন যুবতী,সভয়ে সলজ্জভাবে চারিদিকে চাহিয়া অবগুণ্ঠিত মস্তকেই ডুব দিতেছে, কেহ উপরে উঠিয়া ভিজা কাপড় নিঙ্গড়াইতেছে, কেহ গামছা দিয়া চুলের জল ঝাড়িয়া ফেলিতেছে, আর কেহ বা কৃতস্নানা, হইয়া, শুচিশুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া,ভক্তিভরে যুক্তকরে, মা গঙ্গাকে প্রণাম করিতেছে।

ঘাটে শিবলিঙ্গ দুই চারিটি ছিল। তাহা ছাড়া জগন্নাথ,

শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতির মূর্ত্তিও না ছিল—তা নয়। একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মূলে, অনেকগুলি সিন্দুরচন্দনমণ্ডিত, ইতঃস্তত্‌বিক্ষিপ্ত, শিলা মূর্ত্তি। আর অদূরে শ্মশানবক্ষে প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী কালীপ্রতিমা। এ মূর্ত্তি কত দিনের, কার স্থাপিত, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে ঠাকুরাণী—নাকি বড় জাগ্রত।

এই কালীমন্দিরের এক নিভৃত চাতালে, আমাদের রুদ্র ঠাকুরাণী এক বৈঠক করিয়া, স্থানটাকে গুল্‌জার করিয়া তুলিয়াছেন। সেই স্নানের ঘাটের মজলিসে কোন বর্ষীয়সী তাঁহার পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারের নিন্দা করিতেছেন। তাঁর ছেলেটা পরিবারের আঁচলধরা, মাকে কষ্ট দেয়, বড় ভাইকে মানে না। আহা অমুকের কি সৌভাগ্য যেমন বৌ তেমনি বেটা। কেহ বা বলিতেছেন—ছেলেটা কলিকাতায় গিয়েছে দিদি! তার কোন খপর পাচ্ছিনি। পোড়াদেশে টেলিগেরাপের পথও নেই। বড় মনটা খারাপ হয়েছে—ইত্যাদি।

এই সভার মধ্যে, আমাদের পিসিমা ঠাকুরাণীর প্রেসিডেণ্ট রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আজ আর কথাবার্ত্তা বেশী হলো না। একটা মস্ত হাঙ্গামার ব্যাপারে পড়েছি ভাই! এখনি একবার জমীদার বাড়ী যেতে হবে!"

রুদ্রপিসির পাঁচ কাঠা বাস্তু, আর একখানি মাটীর ঘর ছাড়া আর কোন সম্পত্তিই ছিল না। কি হাঙ্গাম লইয়া যে তিনি জমিদার বাড়ী যাইবেন, তাহা সভাস্থ অনেকে বুঝিতে পারিল না। বামুনপাড়ার ব্রহ্ম ঠাকুরাণী বলিলেন—"জমিদার বাড়ী কেন গা দিদি! এমন কি কাজ?"

রুদ্রাণী একটু মুরব্বিয়ানা ধরণে বলিলেন—"নিজের আর কি কাজ বোন্! স্বামী-পুত নেই যে তার ভাবনা ভাব্‌বো। তবে পরের ভাবনায়, আমাকে জ্বালাতন করে তুলেছে।

বামুনপাড়ার ব্রহ্ম ঠাকুরাণী বলিলেন—"ব্যাপারটা কি দিদি?"

রুদ্রাণী বলিলেন—"তা তোমায় আর অপিত্যয় কি বোন্। কথাটা হচ্ছে কি জান—আগে আমার মাথায় হাত দিয়ে, দিব্বি কর, কাউকে বল্‌বে না!

ব্রহ্ম। তুমি যা নিষেধ কচ্ছো—তাকি বল্‌তে পারি বোন্!

রুদ্রাণী। তবে শোন। কাল রমানাথ চাটুয্যের বাড়ীতে গিয়েছিলুম। দেখলুম, রমানাথের পরিবার বিন্দুর বড় দুর্দ্দশা। পেটের অন্ন চারটী, তাও দু' বেলা জুট্‌ছে না।

ব্রহ্ম। বল কি এতদূর হয়েছে?

রুদ্রাণী। হয়েছে বই কি? শোন তবে ব্যাপার! জান ত কারুর দুঃখ দেখলে, আমার প্রাণটা যেন ফেটে যায়। আমি বিন্দু বৌএর হাউ হাউ কান্না দেখে, শেষ বাড়ী থেকে এক রেক চাল দিয়ে আসি, তবে তাদের রান্না চড়ে!

ব্রহ্ম। আহা! এক সময়ে এদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। রমানাথ ঠাকুরপো, খুব খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে কখন কার যে কি দশা ঐ নারায়ণ করেন, তা কেউ বল্‌তে পারে না। তা তুমি জমীদার বাড়ীতে যাবে কেন?

রুদ্র। আহা! কমলার মা নেহাত ভাল মানুষ কিনা? ঐ পেসন্ন বাবু হচ্ছে, ওদের আপনাআপনি জ্ঞাতগোত্তর। ওর ইচ্ছে,

তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে থাকে। তবে নিজে মুখ ফুটে পেসন্নকে এ কথাটা বলেই বা কি করে? বল—তোমরা বোন্। কাজেই আমায় গিয়ে বলতেই হবে। তা জানত তোমরা সবাই, পরের উপকার কর্ত্তেই আমার জন্ম। আমি বলায় যদি ওদের দুঃখ দূর হয়, তা হলে তা দেখে আমার একটু আনন্দ বই আর কোন লাভই নেই!

এইরূপে সাদার উপর কালী চড়াইয়া, নিরলঙ্কার ব্যাপারটার উপর নানা ছাঁদের ভালমন্দ অলঙ্কার দিয়া, মনের উদারতা প্রকাশ করিয়া, পিসিমা তাঁহার উদরগহ্বরকে অনেকটা খালি করিয়া ফেলিয়া গঙ্গাস্নানের পুণ্যলাভ করিলেন। তারপর তিনি সত্যসত্যই জমীদার বাড়ীর পথ ধরিলেন।

এই ব্রহ্ম ঠাকুরাণী, আগাগোড়া পিসিমার কথাগুলো তাঁহার সম্মুখে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিলেও, পিসিমার অন্তর্দ্ধানের পর, আপনাআপনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—"মাগীর ষোলআনা ব্যাপারই কাণা! কমলার মা তার দুঃখের কথা বলবার আর লোক পেলে না—তাই ওঁকে ডেকে বলেছে। শোন মজার কথা! ওর নিজের চলে চেয়ে মেগে, উনি আবার তাকে এক সের চাল ধার দিয়ে এসেছেন! বুরবুলে মাগী কোথাকার! গায়ে গঙ্গাজল—আর মা গঙ্গার সম্মুখে দাড়িয়ে কি করে মিথ্যা কথা গুলো বললে গা।" ইহার পরই সে সভা ভঙ্গ হইল।

(৬)

সে কালের লোক তাঁহাদের রকমসকমই আলাদা ছিল। ধনী জমিদার প্রসন্নকুমার, ইচ্ছা করিলে একজন পুজারি ব্রাহ্মণ রাখিতে

পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কর্ম্মচারি রাখিয়া জমীদারী চলিতে পারে. কিন্তু নারায়ণের পূজা—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-গৃহে—একটিনিতে চালানো, বড়ই অধর্ম্মের ও অশাস্ত্রীয় কাজ।

তাঁহার বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা ছিল। তিনি নিত্য ঠাকুর পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। খালি তাই নয়—অতি প্রত্যুষে উঠিয়া, স্বহস্তে নারায়ণের জন্য পুষ্পচয়ন করা তাঁহার একটা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল।

তখন হিঁদুয়ানী ছিল। দেবদ্বিজে লোকের বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। স্বহস্তে দেবদেবীর নিত্যপূজার জন্য, মনে একটা প্রবল আগ্রহ ও ভক্তি ছিল। এসব না করায় একটা পাপ হইত, এরূপ একটা সংস্কার ছিল। এজন্য প্রসন্নকুমার স্বহস্তে ফুল তুলিয়া নারায়ণের পূজা করিতেন।

স্নানান্তে, নগ্নপদে, শুচিশুভ্র বস্ত্র পরিয়া, জমীদার প্রসন্নবাবু সবেমাত্র একটী গন্ধরাজ গাছ হইতে দুটী ফুল ছিঁড়িয়াছেন—এমন সময়ে পিসিমা রুদ্রাণী ঠাকুরাণী, সেই উদ্যানেমধ্যে প্রবেশ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন—"কেমন আছ বাবা তুমি ?"

প্রসন্নকুমার, পিসিমাকে দেখিয়াই তটস্থ হইয়া বলিলেন—"কি পিসিমা ! আমাদের যে একাবারে ভুলে গেলে ? আর এবাড়ীতে পায়ের ধুলো যে পড়েই না।"

এইরূপ সাদর সম্ভাষণে, রুদ্রপিসির বুকখানা যেন দশহাত ফুলিয়া উঠিল। পিসিমা সহাস্যমুখে বলিল—"বাবা ! তোমায় আমি প্রাতর্ব্বাক্যে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমার অক্ষয় পরমায়ু হোক।

খুব বাড়বাড়ন্ত হোক। কত অনাথা দুঃখীকে পালন কচ্ছো, তুমি বাবা ?”

প্রসন্নকুমার আরও দুইটী গন্ধরাজ ছিড়িয়া, তাঁহার ফুলের সাজির মধ্যে রাখিয়া বলিলেন—“কে কাকে পালন করে পিসি! ভগবানই পালনকর্ত্তা। মানুষ উপলক্ষ্য বই তো নয়।”

পিসিমা, নৈয়ায়িকী ধরণে শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিলেন,—“তা তো বটেই! মনিষ্যি তার উপলক্ষি হলেও তেমন মন থাকা চাই। বুকের পাটা হওয়া চাই। হাঁ! একটা কথা তোমায় বল্‌বো বলে এসেছি!”

প্রসন্ন। কি কথা পিসিমা?

পিসিমা। দেখ—নারায়ণ তোমার যথেষ্ট বাড়বাড়ন্ত করেছেন, বাবা প্রসন্ন! আমাদের গাঁয়ের মাথাই বল, আর অলঙ্কারই বল, সবই তো তুমি। দুর্গোচ্ছোব, রাস, দোল, না কচ্ছো কি তুমি? তোমার বাড়ীর অন্ন খেয়ে কত নিস্পর লোকে মানুষ হলো—আর আপনার জন কষ্ট পাচ্ছে, এ কথা তোমায় কেউ বলেনি!”

প্রসন্নকুমারের স্বভাবই ছিল, আত্মীয় স্বজনের উপকার করা। তাহাদের দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার চেষ্টা করা। এমন কে সে—নিকট আত্মীয় যে কষ্ট পাইতেছে, অথচ তিনি তাহার সংবাদ লইতেছেন না? এই অপবাদে প্রসন্নকুমার একটু বিচলিত হইয়া ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কার কথা তুমি বল্‌ছো পিসি?”

আর বেশীক্ষণ কথাটা চাপিয়া থাকিলে, প্রসন্নকুমার হয়ত বিরক্ত হইতে পারেন এই ভাবিয়া, রুদ্রপিসি বলিলেন—“মনে

ভেবেছিলুম, কথাটা তোমাকে শোনাব না। কিন্তু না শুনিয়েও থাকতে পাচ্ছি না বাবা। কেননা—তাদের হাঁড়িচড়া বন্ধ হয়েছে। আহা কার যে তখন কি দশা হয়, তা কে বলতে পারে বলো? হাজার হোক্, তারা তোমার আপনার লোক। দশ রাত্রের জ্ঞাত তো।

প্রসন্নকুমার এতক্ষণের পর আদত কথাটা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তুমি ও বাড়ীর বড় বৌএর কথা বলছো নাকি?"

পিসি। হাঁ—তা ভিন্ন আর কার কথা বলবো?

প্রসন্ন। তাঁদের এত কষ্ট হয়েছে?

পিসি। আমি কি আর গঙ্গাজল মাথায় করে, সকাল বেলা মিথ্যে কথা বল্‌বো বাবা পেসন্ন?

প্রসন্ন। তা বল্‌ছি না। তবে তাঁদের এতটা কষ্ট হয়েছে শুনলে, আমি তখনই তার প্রতিকার কর্ত্তে পারতুম। রমানাথ দাদা, আমার জন্য না করেছেন কি? নেমক-হারাম হতে চাই না আমি! নেমক-হারামের চেয়ে বদনাম আর নেই।"

পিসি। তাতো ঠিক। এখন ও চন্দ্র সূর্য্যি আকাশে উঠ্‌ছে। তা তুমি তাদের করবে না তো করবে কে?

প্রসন্নকুমার মনে মনে কি ভাবিয়া বলিলেন—"পিসি! তুমি তাঁদের কিছু বলো না। পুজোটা সেরেই, আমি একবার রমাদার বাড়ীটা ঘুরে আসছি।"

পিসিমা, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া, পরোপকার জনিত একটা আত্মপ্রসন্নতা লাভানন্তর, অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দালানেই

বিরজার সহিত তাঁহার দেখা হইল। আর তিনি যে সেই সকালে তাহাদের বাড়ীতে কি করিতে আসিয়াছিলেন—তাহাও বিরজাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শুনাইয়া গেলেন।

আগুনের হল্কায় হাওয়া লাগিলে, তাহা যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, রুদ্রপিসির মুখে ব্যক্ত, বিন্দুবাসিনীর সম্বন্ধে এই কথাটা এইরূপ ভাবেই গ্রামময় ব্যাপ্ত হইল। আর কমলা, তাহার এক প্রতিবেশীর বাটী হইতে খবরটা শুনিয়া আসিয়া, তাহাব মাকে বলিল।

বিন্দুবাসিনী, এ লজ্জাকর কথা শুনিয়া এতটুকু হইয়া গেলেন। রুদ্রপিসি যে নিশ্চয়ই প্রসন্নকুমারের বাটীতে যাইবেন, একথাও তিনি জানিতেন। তাহার মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, প্রসন্নকুমারেব কাণে যখন কথাটা পৌছিয়াছে, তখন তিনি সময় বুঝিয়া আজই তাহাদের বাড়ীতে আসিবেন।

(৭)

পূর্ব্বদিন বৈকালে একজন প্রতিবেশিনী বাগানের নারিকেল বিক্রয়ের দরুণ, চারিটী পাওনা টাকা, বিন্দুবাসিনীর হাতে দিয়া গিয়াছিল। সেই টাকা হইতে দুইটী টাকা লইয়া, বিন্দুবাসিনী এক প্রতিবেশী কৃষাণকে দিয়া, সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলি আনাইয়াছেন।

কমলা পূর্ব্বদিনে কিছুই আহার করে নাই। তাহার মাতাও একটী ডাবের জল ও খানকয়েক বাতাসা খাইয়া, সমস্ত দিনটা

কাটাইয়াছেন। এজন্য কমলা সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, মা'র জন্য আগে রান্না চড়াইয়া দিল।

ঠিক্ সেই সময়ে তখন বেলা প্রায় দশটার কাছাকাছি, প্রসন্নকুমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"কমলা! কমলা।"

কমলা, তাহার রাঙ্গাকাকার গলার আওয়াজ শুনিয়া, তখনই রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। প্রসন্নকুমার গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া, সে তাঁহাকে "রাঙ্গাকাকা" বলিত।

সশব্যস্তে কমলা বাহিরের দালানেই এক শালকাঠের তক্তাপোষের উপর, একখানি মাদুর বিছাইয়া দিয়া বলিল—"রাঙ্গা কাকাবাবু! বসুন আপনি এখানে। মা নাইতে গেছেন! এলেন বলে।"

প্রসন্নকুমার সেই মাদুরীর উপর বসিয়া বলিলেন—"হাঁ মা! কমলা! আজ কাল আর তুই আমাদের বাড়ী যাস্ নে কেন? একটা বাগানের পথ, মধ্যে ব্যবধান বইতো নয়। অপি, তোর কথা আজ জিজ্ঞাসা করছিল। বোধ হয়, সে আজ দুপুর বেলা তোদের বাড়ী আস্‌বে।"

কমলা বলিল—"যাই কখন কাকাবাবু! মা বুড়ো হয়েছেন সংসারের কাজকর্ম্ম সবই আমাকে কর্ত্তে হয়। আপনি সবই ত জানেন কাকাবাবু।"

প্রসন্নকুমার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তা জানি বৈকি মা! তুই ছেলে বেলা আমার এই কোলে কত উঠেছিস্

কমলি! তোদের দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়। আর আমার অর্পণা ত কমলা বলতে অজ্ঞান।"

এই সময় বিন্দুবাসিনী, আর্দ্রবস্ত্রে সেইস্থানে দেখা দিলেন। প্রসন্নকুমারকে দেখিয়া, মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিলেন, "ওবাড়ীর সব খপর ভাল ত রাঙ্গা ঠাকুরপো?

প্রসন্নকুমার বলিলেন—"হাঁ এক রকম ভাল বৌদি! তা তুমিতো আর আজকাল ও বাড়ীতে পায়ের ধুলো দাও না বৌ দিদি! দাদার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর তোমার সকল স্নেহই চলে গিয়েছে।"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"ও কথা বলোনা রাঙ্গা ঠাকুরপো! তুমি ছাড়া আর আমাদের আছে কে? আমি আর কতদিন? আমি চোখ বুজলে ঐ কমলার ভার তোমাকেই নিতে হবে। বসো একটু! আমি ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আসি।"

কমলা রান্নাঘরে গেল। বিন্দুবাসিনী কাপড় ছাড়িতে গেলেন। এই অবসরে প্রসন্নকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—কি করিয়া আমার মনের কথাটা পাড়ি।

বিন্দুবাসিনী কাপড় ছাড়িয়া আসিলে, প্রসন্নকুমার একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন—"বৌদি!"

বিন্দুবাসিনী। কেন ঠাকুর পো?

প্রসন্নকুমার। "একটা কথা বলবো?"

বিন্দু। স্বচ্ছন্দে। তা আবার তুমি জিজ্ঞাসা কচ্ছো!

প্রসন্ন। তুমি আমার বাড়ীতে চল। বাড়ীর বড় বৌ

তুমি। বাড়ী আমার নয়—তোমার। লোকে যেমন লক্ষীর খুঁচি ভক্তিভরে মাথায় করে নিয়ে যায়, আমি সেই ভাবেই তোমাকে নিয়ে যাবো বৌ দি।

বিন্দুবাসিনী—এ বিনয়সৌজন্যকাতর অনুরোধের কি যে উত্তর দিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। পিসিমার কথায়, প্রসন্নকুমার যখন সশরীরে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি যে এইরূপ একটা অনুরোধ করিতে পারেন ইহা বুঝিয়াই, বিন্দুবাসিনী মনে মনে ইহার জবাব স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি বলিলেন—"তা তোমার আর আমার বাড়ী, এতে আর তফাৎ কি ঠাকুর পো? জানি আমি, আমার মত অনাথা কাঙ্গালের উপর তোমার খুবই দয়া। কিন্তু আমি এ ভিটে এখন ছাড়্‌তে পারবো না। তা হলে তোমার স্বর্গগত দাদার কাছে আমাকে মিথ্যাবাদী হতে হবে। তাঁর শেষ মুহূর্ত্তের শেষ আদেশ, শ্বশুরের ভিটা কখনো ত্যাগ করবে না! কাজেই এখন আমি তোমার বাড়ীতে যেতে নারাজ। তবে এ জেদ্‌টা যে কতদিন বজায় রাখ্‌তে পারবো, তা—"

প্রসন্নকুমার এবার যো পাইয়া বলিলেন—"আমি কি তোমার শ্বশুরের বংশধর নই? আমার ভিটা কি তোমার বাস্তুভিটা নয় বৌদি! তোমার এ বাড়ী যাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সন্ধ্যে পায়, তার বন্দোবস্ত আমি করে দোব। যদি বিরজার জন্য তোমার যেতে কোন আপত্তি থাকে, আমি তোমাদের আলাদা হেঁসেল করে দিতে পারি।

প্রসন্নকুমারের এই উদারতায়, বিন্দুবাসিনী তাঁহাকে মনে মনে খুব আশীর্ব্বাদ করিলেন। যদি রুদ্রপিসি তাঁহার এ দারিদ্রের কথাটা পাড়ায় পাড়ায় এ ভাবে না বলিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে তিনি হয়তো প্রসন্নকুমারের এই কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতেন। কিন্তু এখন গেলে লোকে ভাবিবে সত্যই তখন তাঁহার দুঃখের দশা ঘটিয়াছে।

এই ভাবিয়া সুবুদ্ধিমতী বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"ঠাকুরপো! আমার কথায় রাগ করো না। আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ো না। রুদ্রপিসি পাড়াময় আমার এ দুঃখের দিনের কাহিনী রাষ্ট্র করে দিয়েছে। এজন্য আমার মাথাটা বড় নীচু হয়ে হয়ে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি তোমার বাড়ীতে গেলে লোকে ভাব্‌বে, সত্যিই আমাদের অন্নের অভাব ঘটেছে। এই জন্য এখন যাব না। পরের মাসে ত খোকার পৈতে হবে। বরঞ্চ সেই পৈতের অছিলায়, আমাদের নিয়ে যেও। তার পর আমি ওবাড়ী থেকে আর আস্‌বো না।"

প্রসন্নকুমার বুঝিলেন—কথাটার ভিতর একটা প্রবল যুক্তি বর্ত্তমান। এজন্য তিনি বলিলেন—"তা বেশ কথা! সেই ভাল। ভাল কথা মনে পড়েছে—বৌদি। আর একটা কথা তোমায় বলবার জন্য এসেছিলুম।"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"কি কথা?

প্রসন্ন। কিছু মনে না কর তো বলি!

বিন্দু। আবার অমন করে কিন্তু হয়ে, কথা বলছো ঠাকুরপো?

প্রসন্ন। দেখ! তোমাদের খিড়কীর বাগানটা বে-মেরামতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাগানখানা দাদার বড় সখের জিনিষ ছিল। এত কলমের চারার আম নিচুর ও গোলাবজামের গাছ, এগ্রামে কারও নেই। বাগানখানা আমি জমা নিতে চাই। বে-মেরামতে বাগানটা মিছে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আগাছা জন্মাচ্ছে। আমায় না হয় তিনসনের মেয়াদে ঐ বাগানখানি জমা দাও। আমার অপি তোমার ঐ বাগানের নিচু খেতে ভাবি ভাল বাসে। তরিবতের অভাব হ'লে ত গাছে ফল ফলে না বৌ দি।

বিন্দুবাসিনী, প্রসন্নকুমারের উদারমনের প্রকৃত কথা বুঝিতে পারিলেন। সে দিন কমলা তাঁহাকে এই বাগানখানি বিক্রয়ের পরামর্শই দিয়াছিল। এজন্য তিনি বলিলেন—"তা বেশ কথা। তুমি বাগান আজ থেকেই নাও গে।"

প্রসন্ন। তাহলে প্রতি মাসে বাগানখানার খাজনা হচ্ছে, বাব টাকা। আমি তিন মাসের খাজনা তোমায় আগাম দোব। অপি দুপুর বেলা এ বাড়ীতে বেড়াতে আসবে, তার হাতেই টাকাটা পাঠিয়ে দোব।

বিন্দুবাসিনী দেখিলেন, যে এই বাগানখানির খাজনা অপর প্রজার দরের চেয়ে প্রসন্নকুমার খুব বেশী দিতেছেন। তিনি তাঁহার মনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য বুঝিয়া, এ প্রস্তাবে কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

প্রসন্নকুমার বলিলেন—"তা হলে এই কথাই ঠিক রইলো। বেলা হয়েছে আমি এখন যাই। কিন্তু খোকার ভাতের সময়

তোমাদের ও বাড়ীতে যাওয়াই চাই। তা না হলে আমি বড় মনকষ্ট পাবো।"

এই সব কথাবার্তা যখন হইতেছিল, তখন কমলা সেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রসন্নকুমার চলিয়া গেলে, কমলা বলিল—"মা! আমার রাঙ্গা-কাকার মনটা কত উঁচু দেখ্‌লে? তোমার অভাব বুঝে, পাছে তুমি নগদ টাকা দান বলে নিতে অস্বীকৃত হও, এই ভেবে, উনি বাগানখানি জমা নেবার অছিলা করেছেন। মতি গয়লারা, ঐ বাগানের জন্য মাসে মোটে পাঁচটা টাকা খাজনা দিতে চেয়ে ছিল ত।"

বিন্দুবাসিনী কমলাকে বলিলেন—"তুমি যে সেদিন বাগানখানি বিক্রী কর্ত্তে বলেছিলে মা।"

কমলা বলিল—"আমি কি বুঝি বল? তবে এটুকু বুঝি গরীব দুঃখীর সহায় সেই নারায়ণ। তিনিই কাঙ্গালের ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত করে দেন।

কমলা এই কথা বলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। আর বিন্দু-বাসিনী পূজা আহ্নিক করিতে বসিলেন।

পূজা শেষ করিয়া, বিন্দুবাসিনী ঠাকুর প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন—"নারায়ণ! মধুসূদন! আমার রাঙ্গা-ঠাকুরপোকে দীর্ঘায়ু দাও। আরও ধনদৌলত দাও। গরীবের দুঃখ দেখে যার প্রাণ গলে যায়, সে তো সহজ মানুষ নয়—সে দেবতা।

(৮)

তৃষিতা চাতকিনী. মেঘের বিকাশ দেখিলে, আশাপূর্ণচিত্তে যেমন নবজলধরের বারিবর্ষণের আশায় চাহিয়া থাকে, রাঙ্গাকাকার মুখে অপর্ণার আসিবার কথা শুনিয়া, কমলাও সেইরূপ একটা উৎকণ্ঠাময় আশাপূর্ণ চিত্তে অপর্ণার আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সত্য সত্যই মেঘোদয়ের একটু পরে বারিবর্ষিত হইল। অপর্ণা খিড়কীর দ্বার দিয়া সহসা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কি যেন একটা অপার্থিব আনন্দবশে, একাবারে কমলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—"কম্‌লি! কেমন আছিস্ রে তুই!"

কমলা, অপর্ণার স্নেহরস সিক্ত হইয়া বলিল—আমার আর থাকাথাকি কি বোন্।"

এই কমলা আর অপর্ণা উভয়ে যেন একবৃন্তে দুটী ফুল। দুইটিই ফোটা। দুইটীই পবিত্র। দুইটীই গন্ধ ভরা। দুইটীই দেবভোগ্য। কিন্তু হায়! তাহাদের দুজনেরই অদৃষ্ট বড় মন্দ।

কমলা—সধবা হইয়াও বিধবা। আর অপর্ণার কপালটা, বিধাতা একবারে ভাঙ্গিয়া মুচ্‌ড়িয়া ছার খার করিয়া দিয়াছেন! সে ধনীর কন্যা, ধনীর পুত্রবধু। শ্বশুর-শাশুড়ীর বড় আদরের বৌ। কিন্তু ভগবান তাহার উপর বড়ই বিরূপ। তাহার শ্বশুরবাড়ীবাসের সুখের পথে জন্মের মত কাঁটা পড়িয়াছে।

বঙ্গবিধবা, চিরদিনই মহত্ত্বমাখা ব্রহ্মচারিণীর প্রতিমূর্ত্তি। এ দেবী

মূর্ত্তির পবিত্র বিকাশ ত জগতের কোন দেশেই নাই। অপর্ণা চুল বাঁধে না, একখানা ভাল কাপড় পরে না। সুধুহাতে থাকে, থান পরিয়া থাকিতে বড় ভালবাসে। কিন্তু তার শাশুড়ীর ইচ্ছা, তাহা নয়। তাঁহার একমাত্র পুত্রের বৌ, এই ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তিতে থাকিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য। রূপসী, যুবতী, পুত্রবধুর মলিনমুখ রুক্ষ কেশপাশ, বিষাদ কালিমামাখা বিরস মুখখানি দেখিলে, তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিত, চোখ দুটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, অন্নরুচিত না, নিদ্রা হইত না। তিনি ভাবিলেন "শমন কবলগত-পুত্রের মহাবিয়োগদুঃখময় স্মৃতির এ শোচনীয় নিদর্শন, তাঁহার কাছ হইতে যত দূরে থাকে—ততই ভাল। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার স্নেহের পুত্রবধুকে ইচ্ছা করিয়াই বাপের বাড়ীতে বেশীদিন রাখেন।

বাপের বাড়ীতে অপর্ণা পিতার বিমল স্নেহে ডুবিয়া আছে। কিন্তু তাহার ত মা নাই। এ জন্য এ ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হয় না, মর্ম্মভেদী আকুল নিশ্বাস পড়ে না। বিরজা নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। বিমাতা বিরজা—সে যদি মানুষের মেয়ে ভদ্র লোকের মেয়ে হইত—তাহা হইলে সে তাহার দুঃখে গলিত। কিন্তু তার মন অতি ছোট। রূপ থাকিলে কি হয়, প্রবৃত্তি অতি হীন। তাহার ব্যবহার অতি নীচ। এজন্য সে অপর্ণার সহিত কোন সম্বন্ধই রাখিত না।

এই বালবিধবা ব্রহ্মচারিণী কন্যার মূর্ত্তি দেখিলে, শোকে বিষাদে বুক কাটিত—তাহার পিতা প্রসন্নকুমারের। তিনি অপর্ণাকে বহুবার

বুঝাইয়াছিলেন "মা! যে কটাদিন আমি আছি, থান কাপড়টা পরিও না। শুধু হাতটা করিও না। তবে পূজা-আহ্নিক, ব্রতব্রত কর, ধর্ম্মাচরণ কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। আমি তাহার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

কিন্তু অপর্ণা পিতার প্রথম অনুরোধ রাখে নাই। পিতা যখনই সাদা থান পরার জন্য অনুযোগ করিতেন, তখনই সে কাঁদিয়া ভাসাইত। প্রসন্নকুমার তাহার ইচ্ছার প্রতিকুলে দাঁড়াইয়া, তাহাকে মনোবেদনা দিতে চাহিতেন না। এজন্য মনের কষ্ট চাপিয়া রাখিয়া তিনি সবই সহিতেন। সময় সবই সহাইয়া দেয়। ক্রমে প্রসন্নকুমারও ঐ বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া গেলেন।

তবে প্রসন্নকুমার অপর্ণার বাসের জন্য, ত্রিতলে একটী সুন্দর কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ত্রিতলেই ঠাকুর-ঘর। অপর্ণা ঠাকুরের সেবায়, ঠাকুরের পুজায়, পুস্তকপাঠে দিনের অধিকাংশ কাটাইত।

অপর্ণার একমাত্র সখী, সুহৃৎ, অন্তরঙ্গ, সঙ্গিনী—এই কমলা। আগে আগে কমলা প্রায়ই অপর্ণার সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে দেখা করিতে যাইত। এখন দুঃখের দিন আসায় আর মাতার বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন সংসারের কাজকর্ম্ম বেশী চাপিয়া পড়ায়, সে বড় একটা অপর্ণাদের বাড়ীতে যাইত না। এজন্য অপর্ণা, কমলার উপর অভিমান করিত, রাগ করিত, থাকিতে না পারিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইত, কিম্বা খিড়কীর বাগানের ভিতর দিয়া, সহসা তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইত।

এ দিনও ঠিক তাই হইয়াছে। অপর্ণা কমলাদের বাড়ীতে আসিয়া তাহার গালে একটী মৃদু ঠোকর মারিয়া বলিল—"কম্‌লি! তুই ভারি দুষ্টু!"

কমলা বলিল—"কেন ভাই?"

অপর্ণা। তুই আর আমাদের বাড়ী যাস্‌না কেন?

কমলা। সময় পাই কই বোন্‌?

অপর্ণা। প্রাণের টান থাকলে সময় করে নেওয়া যায়। যে বৌ সংসারের কাজ করে, সে কি চুল বাঁধে না?

কমলা। সেটা সত্য! কিন্তু!

অপর্ণা। কিন্তু কি?

কমলা। তোমার ঐ মামা বাবুটীর বিকৃত চাউনীটাকে আমি ভাই বড় ভয় করি।

অপর্ণা। কি করবো বল? আমিও তাঁর ত্রি-সীমানায় যাই না। ওরা তিন জনে দেখছি, আমাদের বাড়ীর সুখ শান্তি ছারে-খারে দিলে।

কমলা। তিনজন কে কে?

অপর্ণা। আমার ঐ নূতন মা, আর তাঁর গর্ভধারিণী, আর ঐ রেমো মামা। দিনরাত কিচ্‌কিচি। চাকর চাকরাণী দুদিন টেকে না। বাবা এই সব দেখে শুনে, হতভম্ব হয়ে গেছেন। বাবার মুখ ভার দেখ্‌লে, আমার বুক যেন কেটে যায়! এই বাপ-ছাড়া আমার আর কে আছে বোন্‌? কি যে হবে কপালে তা জানিনি?

কমলা। যা হবার তাই হবে। ভগবানের সংসারে তাঁরই বিধানে যা কিছু ঘটে, তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। কখন যে কোথা থেকে ঢেউ এসে, কোন পাড়টা ধসিয়ে দেবে, তাত কেউ জান্‌তে পারে না। নারীব প্রধান গুণ সহিষ্ণুতা। তা—অপি! তোর ত সে গুণ যথেষ্ট। সয়ে যা বোন্—সয়ে যা।

কমলা দেখিল—অপির ডাগর চোখ দুটী ছল ছল করিতেছে। এজন্য সে তখনই কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"আজ রাঙ্গা কাকা এ বাড়ীতে এসেছিলেন তা জানিস্।"

অপি বলিল—"সব জানি আমি।"

এই "সব জানি আমি" কথাতেই ভিতরের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কমলার কোন কথাই অপির কাছে গোপন ছিল না। অপির ও তাই। কমলা বলিল—"অপর্ণা! বোন্! কখন যে কার কি দশা হয়, তা কি কেউ বল্‌তে পারে?"

অপর্ণা বলিল—"তা ত ঠিক। ভগবানের মরজি! কিন্তু তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি!

কমলা। কি কথা?

অপর্ণা। ঠিক বলবি?

কমলা। তোকে বলবো না—তকাকে বলবো ভাই?

অপর্ণা। তুই কেন কষ্ট পাস বোন্! বোনায়ের বাড়ীতে গিয়ে,—চেপে বস্‌গে যা। তুই সেখানে গেলে আমি না হয় জ্যাঠাই-মাকে দেখ্‌বো!

কমলা। তোর বোকা বোনাই আমাকে আমল দেয় কইলো?

অপর্ণা। আমল করে নিতে হয়। অমন ডাগর ডাগর দুটো চোখ, অমন টুকটুকে রং, তোর কি কোন ক্ষমতাই নেই—পোড়ার মুখি!

কমলা। থাকলে আর এ দশা হয় বোন?

অপর্ণা। তোকে এবার যেতেই হবে?

কমলা। কোথায়? যমের বাড়ী?

অপর্ণা। বোনাই কি তোর যম? বাবাকে বলে সব বন্দোবস্ত ঠিক করে, আমি তোকে এবার সেখানে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবো।

কমলা। যো হুকুম! কিন্তু সেখানে যে আরও দু'দুজন ঘাটী আগলে বসে আছে। তুই যেন পাঠালি, কিন্তু তারা আমল দেবে কেন ভাই?

অপর্ণা। তুই বুঝি তাই মনে করেছিস্! বোনাই তেমন বোকা নয়। তাদের একটাও বারমাস তাঁর ঘর করে না। রাঁধবার বাড়বার, সংসারের কাজকর্ম্ম করবার জন্য, খালি তাদের এক এক জন পালা করে সেখানে পড়ে আছে। তাঁদের তোর মতনই দশা!

কমলা। তা সেখানে যে আছে, সেই বা আমায় আমোল দেবে কেন? সতীনে কি স্বামীর ভাগ সহজে দিতে চায়?

অপর্ণা। আমি বলছি দেবে। তুই একবার সেখানে গিয়ে দেখ দিকি? তোর মিষ্টি কথা, সরলপ্রাণ, সুন্দর রূপ, তোর এই স্বামী দখলের হকিয়ৎ মামলার জোর সাক্ষী। তোরই মামলা জিত হবে।

কমলা। তুই তাদের ঘরের খপর জান্‌লি কেমন করে ?

অপর্ণা। জানিস্ ত আমাদের কুসুমপুরের বাড়ীর কানাচেই তাদের বাড়ী। বোনাই বাড়ীর ভিতরের সব কথাই আমি জানি! তোকে এবার যেতেই হবে।

কমলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"যার কাছে যাবো তার সঙ্গে আগে দেখাই হোক্ !"

অপর্ণা। হবে! ভগবানকে ডাক!

কমলা। ভগবানকে ডাক্‌লেই কি স্বামীকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় বোন্ ?

অপর্ণা। যায় বই কি! আমি যে পাই! স্ত্রীলোকের চোখে, স্বামী আর ভগবান কি ভিন্ন ?

অপর্ণা আর বলিতে পারিল না। "আমি যে পাই।" এই কথা কয়টী বলিতে, তাহার চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

কমলা দেখিল, ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ উপস্থিত। সে এ কথা সে কথা তুলিয়া, অপর্ণার মনটাকে অন্য দিকে লইয়া গেল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া, অপর্ণা বলিল—"আজ তবে আমিও যাই। কাল তোর যাবার পালা রইলো। যেতেই চাস্ কম্‌লি! না হ'লে আমি আড়ি করবো!"

কমলা অপর্ণার চিবুক খানি ধরিয়া, স্নেহভরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"যো হুকুম।"

প্রস্থান সময়ে, অর্পণা তাহার আঁচল হইতে চারি খানি নোট বাহির করিয়া, কমলার হাতে দিতে গেল।

কমলা বলিল—"এ কি! নোট কেন?"

অপর্ণা। কেন তা জানি না! বাবা বলে দিয়েছেন—"তোর জ্যাঠাইমাকে বাগানের খাজনা তিন মাসের অগ্রিম পাঠালুম। দিয়ে আসিস্। কেননা তাঁদের খিড়কীর বাগান, আমি জমা নিয়েছি। তাঁকে দিলেই তিনি বুঝতে পারবেন।"

কমলা বলিল—"তা সেত ছত্রিশ টাকা!"

অপর্ণা। তোর এত ছত্রিশ বত্রিশ হিসেবের দরকার কি লা ছুঁড়ী? আমি তোর বড় বোন। যা বল্‌ছি তাই কর।

কমলা। তুই ও টাকা মার হাতে দিগে যা।

অপর্ণা কৃত্রিম বিরক্তির সহিত বলিল—"আ মর ছুঁড়ি! মা আর তুই কি ভিন্ন! আমি চল্লুম। কাল তুই যেতেই চাস্।" এই কথা বলিয়া অর্পণা, কমলার আঁচলে নোট চারি খানি বাঁধিয়া দিল।

কমলা এ ব্যাপারে আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না। সে কেবল বলিল—"তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি চল্ বোন্!"

অপর্ণা বলিল—"না—রে—না। পথে জুজুর ভয় আছে।" এই কথা বলিয়া তাহার বিষাদমলিন মুখে, একটু হাসি ফুটাইয়া অপর্ণা, দ্রুতবেগে খিড়কীর দ্বার দিয়া অদৃশ্য হইল।

(৯)

আষাঢ় মাস। অম্বুবাচীর পর বৃষ্টি নামিয়াছে। মাসও শেষ হইতে যায়। গ্রীষ্মকে তাড়াইয়া দিয়া, বর্ষা তাহার একচ্ছত্র রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন। পুত্রশোকাতুরা জননীর চোখের অশ্রুধারার মত বর্ষার ধারা—ধরার বুকে বৃষ্টিরধারা ঢালিতেছে। মাঝে মাঝে খুব ঘোর ঘনঘটা করিয়া মেঘ উঠিতেছে। আর মুষলধারে এক চোট বৃষ্টি হইয়া গেলেই—মেঘের সে জলভরা নীলিমামাখা মুর্ত্তিটা, ধূসরবর্ণে পরিণত হইতেছে।

পল্লীগ্রামের মেটে রাস্তাগুলি একবার বর্ষার স্বচ্ছলধারা পাইলে হয়! এক হাঁটু কাদা চারিদিকে। তার উপর হাটুরিয়াদের যাতায়াতে, আর গরুর গাড়ীর উপদ্রবে, সংস্কারবিহীন মৃণ্ময়পথ, যেন পঙ্কিল পুকুরপাড়ের অবস্থায় দাঁড়াইয়া যায়।

কমলা ও অপর্ণার সাক্ষাতের একপক্ষ পরে, একজন পথিক বর্ষার এই কর্দ্দমময় পল্লীপথে, অতিকষ্টে পথ চলিতেছেন।

লোকটীর বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, কি উত্তীর্ণ হইয়াছে। গাত্র উত্তরীয়শূন্য। জিউলীর আঠায় মাজা, শুভ্র পৈতারগোছাটী তাহার বিশাল বক্ষে লম্ববান। চাদর খানি বেড় দিয়া কোমরে বাঁধা। বামহাতে একটী ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ব্যাগের গায়ে, একখানি গামছা জড়ানো। আর সেই ব্যাগের বাহিরে লম্বমান রজ্জুতে আবদ্ধ একটী ছোট হুঁকা। হুঁকার কলিকা ও অন্যান্য সরঞ্জাম খুব সম্ভবতঃ সেই ব্যাগের মধ্যেই ছিল।

বেলা তখন বারটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও এই কর্দ্দমাক্ত পথের সহিত মহাসংগ্রাম করিয়া, অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আর যেন পথ চলিতে অশক্ত।

অদূরে একটী ক্ষুদ্র হাট। সে দিন হাটবার নয়, এ জন্য তথায় জনপ্রাণী নাই। তবে কয়েকখানি দোকানঘর, যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপে সেখানে বিরাজ করিতেছিল—সে ঘর কয়খানিতে লোক জন আছে।

দোকানের সংখ্যা ত মোটে পাঁচ খানি। একখানি ময়রার আর দুইখানি মুদীখানার। চতুর্থ খানি কাপড়ের ও পঞ্চম খানি, মনিহারীর ও বেণেতি মসলার।

ব্রাহ্মণ সম্মুখবর্ত্তী ময়রার দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই, দোকানী তটস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেননা—ব্রাহ্মণের চেহারা খানি বড় সুন্দর। শুভ্র যজ্ঞোপবীত, আর ঘৃতদুগ্ধপুষ্ট সেই সুন্দর কান্তিময় মূর্ত্তিটী দেখিবামাত্রই, দোকানীর মাথা আপনি নইয়া আসিল।

দোকানী বলিল—"প্রাতঃপ্রণাম দেবতা! আপনার আসা হইতেছে কোথা হইতে?

ব্রাহ্মণ এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, তাঁহার কর্দ্দমাক্ত পদদ্বয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করায়—দোকানী দেখিল, ঠাকুরের চরণযুগল কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। সর্ব্বাগ্রে পা ধুইবার জলের প্রয়োজন।

ময়রার পো, তখনই একঘটা জল লইয়া, ব্রাহ্মণের পদধৌত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু এক ঘটা জলে, সে কাদার

কলঙ্ক ধুইল না। দোকানী ত্রস্তগতিতে উঠিয়া, আবার এক ঘটী জল আনিয়া সেই চরণযুগলকে কর্দ্দমপরিশূন্য করিয়া দিল। তৎপরে দণ্ডবৎ হইয়া একটী প্রণাম করিয়া, যুক্তকরে বলিল—"আজ ভাগ্য ভাল, যে ব্রাহ্মণের পায়ের কাদা ধোয়াইতে পারিলাম।"

দোকানীর এই প্রকার ভক্তি দেখিয়া, ব্রাহ্মণ ঠাকুর বড়ই প্রীত হইয়া বলিলেন—"তোমার মঙ্গল হোক্। এ দোকান খানি তোমার বাপু?"

দোকানী। আজ্ঞে হাঁ দেবতা!

ব্রাহ্মণ। পথ চল্‌তে বড়ই পরিশ্রম হয়েছে, একটু তামাকু খাওয়াতে পার?

দোকানী। কেন পারবো না? সেকি কথা!

"ওরে পরাণ শীঘ্র বামুনের হুঁকাটা ফিরিয়ে এক কল্কে তামাক সেজে নিয়ে আয়।" বলিয়া এক হাঁক দিবামাত্র, পরাণ তামাকু সাজিতে ও হুঁকা ফিরাইতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বাবু! আমি অপরের হুঁকায় খাই না। খালি একটী কল্কে সাজিয়া আন। হুঁকা আমার কাছে আছে। আর একটু কলাপাতা না হয় আমপাতা হ'লে, বড় ভাল হয়। নল করে নিই।"

ব্রাহ্মণ নিজের হুঁকাটী বাহির করিয়া দোকানী প্রদত্ত কলাপাতায় একটী নল তৈয়ারী করিয়া তাহা হুঁকায় লাগাইয়া, হুঁকাটী এক বাঁশের খুঁটীর গায়ে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া বলিলেন, "বেলা কত হলো বোধ হয়?"

দোকানী আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজ্ঞে দুপুর হয় বলে আর কি? তা এখানে রসুএর বন্দোবস্ত হতে পারে। ঐ মুদীখানা, দোকানটাও আমার। যা হুকুম করবেন্ তাই পাবেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এখান থেকে কুন্দগ্রাম কতদূর?"

মোদকের পো, একথা শুনিয়া একটু দমিয়া গেল। সে বলিল—"আজ্ঞে! আর দেড়কোশ টাক গেলেই কুঁদ গাঁ। তা কুঁদগায়ে কাদের বাটীতে যাবেন দেবতা?"

ব্রাহ্মণ। রমানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে!

মোদক। বটে! আহা! তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। আপনি তাঁর কে হন?

ব্রাহ্মণ। জামাতা।

খরিদ্দার হাত ছাড়া হইয়া যাইবার উপক্রম লইলেও, মুদীর হৃদয়, ব্রাহ্মণভক্তিশূন্য নহে। কেননা সেকালের পল্লীগ্রামের বয়োবৃদ্ধ লোক সে!

এই সময় পরাণ কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে, সেই স্থানে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত হইতে কলিকাটী লইয়া হুঁকায় বসাইয়া—খুব দম ভরিয়া তামাকুতে টান মারিতে লাগিলেন। টানের চোটে ঘুঁটের আগুণ, দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

তামাকু খাওয়া শেষ করিয়া, ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বাপু! অনেকটা পথ এই কাদা ঠেলে আস্তে হয়েছে। এর জন্য এখন এমন ইচ্ছা নেই যে নিজে পাক করি। তা সন্ধ্যা আহ্নিক স্নানাদি

সেরে বেরিয়েছি। তোমার দোকানে একটু জলযোগ করে না হয় যাই। এতটা সেবাযত্ন নিলে, কিছু না খাওয়াটা ভাল দেখায় না। মনে ভাব্‌ছি—নয় শ্বশুরবাড়ী, না হয় এই গ্রামের এক শিষ্যবাড়ী গিয়ে আহার কর্ত্তে হবে। তোমার এত ভক্তিশ্রদ্ধা। কিছু না খাওয়া ভাল দেখায় না।

দোকানী দুটী হাত জোড় করিয়া বলিল—"সেকি দেবতা! পয়সার পিত্যেশ করে আমরা হাটের মাঝখানে এই দোকান বসিয়েছি বটে, কিন্তু আপনার মত নিষ্ঠে ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো কি সহজে পড়ে? তা কি সেবা হ'বে হুকুম করুন?

ব্রাহ্মণ। উৎকৃষ্ট কাঁচা-গোল্লা আছে কি?

দোকানী। আজ্ঞে আছে বই কি! আধসেরটাক দি।

ব্রাহ্মণ। না, পোয়াটাক দাও। যখন সর্ব্বাগ্রে শিষ্যবাড়ী যাচ্ছি, তখন এখান থেকে পেটটা ভরিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়। কি বল?

দোকানী সহাস্যে বলিল—"আজ্ঞে তা বই কি।" তারপর সে একপোয়া সন্দেশ ওজন করিয়া, একটী শালপাতার ঠোঙ্গায় রাখিয়া, ব্রাহ্মণের হাতে দিল। পরাণচন্দ্রও একটী ঘটি বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া মাজিয়া, জল আনিয়া দিল। বামুনঠাকুর একখানি আধ ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া সন্দেশগুলি মুহূর্ত্ত মধ্যে উদর মহাগর্ভে প্রেরণ করিয়া—ঢোক ঢোক করিয়া একঘটী জল খাইয়া, আত্মার কষ্ট নিবারণ করিলেন।

তৎপরে তিনি সন্তর্পণে ব্যাগের মধ্য হইতে, একটী নেকড়ার

পুটুলী বাহির করিলেন। তাহার মধ্য হইতে একটী সিকি লইয়া বলিলেন "কত দিতে হবে গা ময়রার পো।"

ময়রা বলিল—"আজ্ঞে দশ পয়সা দিন। ব্রাহ্মণকে সন্দেশ খাইয়ে দাম নিতেই নেই, তবে আমরা ব্যবসায়ী লোক। দোকান যখন খুলে বসেছি, তখন ধর্ম্মের ভাণ আর লজ্জা করলে চলবে কেন?"

এই কথা শুনিয়া—ব্রাহ্মণ সহাস্যমুখে সেই সিকিটী দোকানীর হাতে দিলেন। বাকী ছয়টী পয়সা, দোকানদার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিলেন—"আমার শ্বশুরকে তুমি জানতে তাহ'লে?"

দোকানী। আজ্ঞে—খুবই জানতুম। চাটুয্যে মশাই প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। তাঁর নাম ক'ল্লে দিন ভাল যায়।

ব্রাহ্মণ। এখন তাঁদের অবস্থা কেমন? চল্‌ছে কেমন?

দোকানী। আজ্ঞে চালাবার কর্ত্তা সেই ভগবান্‌। তবে মানুষটী থাক্‌তে, যেমন একটা বোলবোলা জমজমাট্‌ ছিল, এখন আর সেটা নেই। কষ্টে চল্‌ছে।"

কথাটা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখটা একটু অপ্রসন্নভাব ধারণ করিল। তিনি ব্যাগটী হাতে লইয়া, দুর্গা শ্রীহরি বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তারপর আবার সেই কর্দ্দমাক্ত পথে নামিয়া, শ্বশুর বাড়ীর দিকে না গিয়া, শিষ্যবাড়ীর পথ ধরিলেন।

এই সময়ে এক রাখাল বালক গরু তাড়াইতে তাড়াইতে গাহিতেছিল—

"কে যাবি মথুরা পানে, আমার সঙ্গে আয়।
সুজ্জিমামা বস্‌ছে পাটে, বেলা ব'য়ে যায়॥"

(১০)

এখন কমলাদের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিব। কমলা, অর্পণাকে বলিয়াছিল, সে দুই এক দিনের মধ্যে তাহাদের বাটীতে যাইবে। কিন্তু সে এপর্য্যন্ত তাহার সময় করিতে পারে নাই, কেননা, সংসারে তাহার মা একা। আর তিনি পীড়িতা।

জননী বৃদ্ধা এবং রোগজীর্ণা। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি যেন আরও অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন। কাজেই কমলাকে সংসারেব সব কাজই করিতে হয়।

অপর্ণার আনীত টাকাগুলি পাইয়া বিন্দুবাসিনী বুঝিলেন—যে এটা তাঁর প্রসন্নঠাকুরপোর বাগান-জমা নেওয়া নয়, প্রকারান্তরে তাহাদের সংসার চালাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা। বাগান-জমা লওয়া কেবল একটা অছিলা মাত্র। তিনি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার এ মহত্ত্বের জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সাত পাঁচ ভাবিয়া, বৃদ্ধা এটাকা লইতে অস্বীকার করিলেন না। দান হইলে হয় তো করিতেন।

আহারাদির পর, একদিন কন্যাকে লইয়া বিন্দুবাসিনী সংসারের দেনা পাওনার হিসাব করিতে বসিলেন। এই কয়টা মাস ধার করিয়াই চলিয়াছে। মুদীর দোকানের দেনাটা, পনেরো টাকার উপর হইয়াছে। কমলার জন্য একজোড়া আটপৌরে শাড়ী ও

তাঁহার নিজের জন্য এক জোড়া থান, এও দেনা করিয়া আনা হইয়াছে। তার দাম তিন্‌টে টাকা। কৃষ্ণ তেলীর তেলের উঠ্‌নে দুই টাকা বাকী। জোন্‌ লইয়া রান্নাঘর ছাওয়ান হইয়াছিল, তার জন্য তিনজন জোনকে টাকা ধার করিয়া, রোজের দাম দেওয়া হইয়াছে। এ ছাড়া আরও খুচরা দেনা আছে।

সমস্ত দেনা মুখে মুখে হিসাব করিয়া দাঁড়াইল—পঁয়ত্রিশ টাকা। এই দেনার টাকা গুলো শোধ না করিলে, তাঁহাদের সংসার অচল হইবে। অন্ততঃ মুদীকে পনরটী টাকা ত আজই দেওয়া চাই। এই সব ভাবিয়া, বৃদ্ধা বিষণ্নমনে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কমলা টাকা ত শুন্‌তে চল্লিশ। হিসেব করে সবাইকে দিয়ে থুয়ে দেখ্‌ছি, থাক্‌বে হাতে মোটে পাঁচ। আবার তিন মাস না গেলে ত প্রসন্ন ঠাকুরপোর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না।

কমলা বলিল—"মা, তুমি এ বয়সে ওসব ভাবনা ভেবনা। চলাচলির উপায় সেই নারায়ণ। যিনি সামান্য পোকা-মাকড়ের পেট চলবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন, তিনি যে এক ব্রাহ্মণের বিধবা আর হতভাগ্য কুলীনকন্যার পেটের ভারটা নেবেন না, এটা অসম্ভব। আমরা তাঁর উপর-নির্ভর কর্ত্তে পারিনি, বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনি, নিজেদের ভাবনা নিজেরাই ভাবি, এইজন্য ভগবানের করুণা যে গরীব অনাথার উপর কত বেশী, তার পরীক্ষায় অবসর পাইনি।

গৃহিণী। তা সত্যি বটে মা! তা আমার জন্যে ত এসব ভাবনা ভাবি না! আমার যত ভাবনা তোমার জন্য।

কমলা। আমার জন্য যে এতকাল ভেবে এসেছ, কিছু কর্তে পেরেছ কি মা? যে কাজ কল্লে কোন ফল হয় না, তা করার দরকার কি? আমার এখন মনে হয়, বিধাতা যদি আমাকে তোমার মেয়ে না করে, সন্তান করে দিতেন—তা হলে ভিক্ষে করে মোট ব'য়ে এনেও তোমার ভাবনা দূর করতুম।

বৃদ্ধা। তা হলে আর এ দুর্দ্দশা হবে কেন মা? অদৃষ্টের ভোগ খণ্ডায় কে? তবে এটা জানিস কমলা, আমি যতদিন আছি ততদিন তোর কোন ভাবনাই নেই। আমি ম'লে তোর কি দশা হবে কমলা? কোথায় যাবি তুই? গোবিন্দ তোকে নিয়ে যদি যায়, তা হলে আমার প্রাণের বোঝাটা, অনেক হাল্‌কা হয়ে যায়। আমি নির্ভাবনায় মর্‌তে পারি।

কমলা বলিল—"সে আশা তুমি ত্যাগ কর। আমার অদৃষ্টে যদি সুখই থাক্‌বে, তা হলে এমন হবে কেন? যাই হোক্‌—বেলা পড়ে এসেছে। রাখালের বাপকে ডেকে আনি। তার হাত দিয়ে বাজারের দেনাটা শোধ করে ফেলা যাক্‌। ঘরে চাল দাল নুন তেল—এক ফোঁটা নেই।"

কমলাদের প্রতিবেশী এই রাখালের বাপ। সে বয়োবৃদ্ধ। জাতিতে সদ্‌গোপ—নাম সদানন্দ। স্বর্গীয় রমানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অর্থাৎ কমলার পিতা, সদানন্দের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা যাহাদের ছোটলোক বলি, অশিক্ষিত বর্ব্বর বলিয়া যাহাদের দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উপহাস করি, চাষা বলিয়া যাহাদের ঘৃণা করি, তাহারা কখনও নেমকহারাম হয় না।

উপকার পাইয়া উপকারীর অনিষ্ট করে না। আজীবন গোলামের মত হইয়া থাকে।

রাখালের বাপের বয়স পঞ্চাশের উপর। কিন্তু তখনও সে শ্রমসহিষ্ণু ও বলিষ্ঠ দেহ। চারি পাঁচটা গরু লইয়া চাষ ও ক্ষেত-খামারের কাজ সে যেন যুবাপুরুষের মত করে।

সেদিন ক্ষেতের কোন কাজ ছিল না। এজন্য সদানন্দ দাওয়ায় বসিয়া ঢেরা ঘুরাইয়া, পাট কাটিতেছিল। এমন সময়ে কমলা তাহার দাওয়ার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—"সদা দাদা! মা তোমাকে ডাক্‌ছেন। একবার শীঘ্র করে এস।"

পাট কাটা ফেলিয়া, সদানন্দ তাহার মোটা ময়লা গামছাখানা দিয়া মুখটা মুছিল। তার পর ঢেরাটী চালের বাতায় তুলিয়া রাখিয়া বলিল—"চল দিদি! এ গুলো তুলে রেখে আমি এখনি যাচ্ছি। বৌ আজ খুব ভাল মুড়ি ভাজ্‌ছে। তুমি চারটি গরম মুড়ি আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাও।"

সদানন্দের পত্নী অর্থাৎ রাখালের মা যেখানে মুড়ি ভাজিতেছিল, কমলা সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। যেমন সদানন্দ—তার পত্নীও তেমনি। হায়! শিক্ষাভিমানী, কুটবুদ্ধি দাম্ভিক! ইহাদের হৃদয়ে যে সুখ, যে সরলতা, যে সহানুভূতি, যে পরোপকার প্রবৃত্তি, তাহা তোমার হৃদয়ে কই!

সদানন্দের পত্নী সহাস্যে বলিল—"আজ কি ভাগ্যি গো! অনেক দিন পরে যে কমলা দিদিমণির পায়ের ধুলো পড়্‌লো।"

কমলা বলিল—"সময় পাই কই বৌ-দিদি! তবে তোমরা যে এই দুঃখের দিনে আমাদের ভোল নি, এই আমাদের ভাগ্যি!"

সদানন্দ-পত্নী জিভ্ কাটিয়া বলিল—"ওমা! ওকি কথা গো দিদিমণি! ছেরোকাল যে তোমাদের খেয়েই আমরা মানুষ। তোমার বাবা আমাদের জন্য না করেছেন কি? পোড়া ইজারাদারে ত বাকীর জন্য, আমাদের জমী জমা সব নিলেম করিয়ে নিয়েছিল। এই কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে, আজ যে আমাদের পথে বসতে হতো দিদি! ভাগ্যে তোমার বাপ্ কোমর বেঁধে এসে দাড়ালেন, তাই ত আমরা রক্ষা পেলুম। আহা! অমন মনিষ্যি কি হয়? যেন দেবতা!"

কমলা পিতৃপ্রশংসা শুনিয়া, একটা গর্ব্ব অনুভব করিল। সে মনে মনে বলিল—"ধন্য এই চাষীলোকের দল, যারা উপকার ভোলে না। আমার বাবা অনেক ভদ্রলোকের, অনেক উপকার করে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের এই দুঃখের দিনে, তাদের কেউ ত একবার আমাদের মুখের দিকেও চেয়ে দেখে না।"

কমলা বলিল—"তুমি এখন সংসারের কাজ কর। আমি এখন যাই বৌদি। আর একদিন না হয় আসবো।"

রাখালের মা বলিল—"দিদিমণি! তা হচ্ছে না। যখন পায়ের ধুলো দিয়েছ, তখন চাট্টি গরম মুড়ি নিয়ে যেতে হবে। যে নূতন ক্ষেতখানা উনি এবার একা চাষ করেছিলেন, সেই ক্ষেতের ধানের এই মুড়ি! আহা! কি সুন্দর মুড়ির ধানই হয়েছে এবার!"

রাখালের মা, একটী মাঝারি গোছ ধামায়, সের দুই মুড়ি আর তার সঙ্গে খানিকটা তালের সন্নাগুড় দিল। তার পর

ধামাটী কমলার হাতে দিয়া বলিল—"তালের গুড়ও কালকে নূতন তৈরি হয়েছে। এখনও আমরা ছুঁইনি। ভাগ্য ভাল—যে আগে বামুন-দেবতার ভোগে এল।"

কমলা এগুলি লইতে নারাজ, আর রাখালের মাও ছাড়িবে না। অগত্যা কমলা, ধামাটী আঁচলে ঢাকিয়া বাড়িতে চলিয়া গেল।

বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, তাহার মাতা সেই চারিখানি নোট সদানন্দের হাতে দিয়া, তাহাকে কার কত দেনা, কাকে কত দিতে হইবে, তার একটা মৌখিক হিসাব করিয়া দিতেছেন।

সদানন্দ হিসাব বুঝিয়া লইয়া, বাজারে চলিয়া গেল। গৃহিণীর উপদেশ মত দেনা দিয়া ও জিনিষপত্র কিনিয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিল মোটে চারিটী টাকা। এই চারিটী টাকা, এই বিধবার ও তাহার কন্যার তিন মাসের জীবন সম্বল!

কমলা মনে মনে বলিল—"হা ভগবান! মধুসূদন! যাহারা তোমায় দিন রাত ভাবে, দুঃখের জ্বালায় তোমায় প্রাণ ভরিয়া ডাকে, তাহাদের এত দুঃখ আনিয়া দাও কেন দয়াল প্রভু! যদি বল তাহাদেরই পরীক্ষা করিতেছি! কিন্তু দেব! তোমার এ বিরাট পরীক্ষার প্রচণ্ডশক্তি, ক্ষুদ্রজীব তাহারা সহিতে পারিবে কেন? যদি বল তাহাদের কর্ম্মফলে তাহারা এইরূপ ভুগিতেছে, তাহাহইলে বলিয়া দাও, প্রভু! সে কর্ম্মফল খণ্ডন কিসে হয়? কর্ম্মের অধিপতি ত তুমি! চালক তুমি, নায়ক তুমি। তুমি যা করাও, আমরা তাই করি। তবে কেন শাস্তি পাই প্রভু?"

(১১)

অনেক দিন আমরা পিসিঠাকুরাণী, শ্রীশ্রীমতী রুদ্রাণী দেবীর কোন সংবাদ লই নাই। কিন্তু যাঁহারা এই রুদ্রাণী-চরিত্রের গূঢ়রহস্যজ্ঞ, তাঁহারাই মধ্যে মধ্যে তাঁহার এইরূপ অন্তর্দ্ধানের কারণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সে কারণ আর কিছু নয়, পাড়ার নূতন কোন সংবাদ খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলেই, পিসিমা পল্লীভ্রমণ বন্ধ করিয়া, নিজের কুটীর কারাগারে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার ও কন্যার উপর, পিসি একটুও অসন্তুষ্ট ছিলেন না। কেননা—এ দুনিয়ায় বোবার শত্রু নাই। পিসিমা ঠাকুরাণীর সকল কথাতেই, বিন্দুবাসিনী ও কমলা "হাঁ" দিয়া যাইতেন। কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেন না। এজন্য পিসিমা, তাহাদের অনেকটা পছন্দ করিতেন।

কিন্তু আদানপ্রদান লইয়াই হইতেছে, এই সংসারের কাজকর্ম্ম। সেবারে বিন্দুবাসিনীর ঘরের সংবাদ, জমীদার প্রসন্নকুমারের বাটীতে পৌছিয়াছিল। এবারের সংবাদ, খোদ প্রসন্নকুমারের নিজ বাটীর সম্বন্ধে। কাজেই পিসিমাতা, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় করিয়া খিড়্‌কীর দ্বার দিয়া, সহসা বিন্দুবাসিনীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"ও কমলের মা! কেমন আছিস্ গোংবোন্?"

বিন্দুবাসিনী, সেইদিন আহারান্তে একটী ছোট মাদুর পাতিয়া, একটু বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন। সহসা পিসিমার

পরিচিত কণ্ঠ স্বর শুনিয়া, বাহিরের দালানে আসিয়া—আর এক-খানি ভাল মাতুর সেই দালানে বিছাইয়া দিয়া বলিলেন—"এসো ঠাকুর্জি! অনেক দিন তোমার দেখা পাই নি! মনে কচ্ছিলুম, হয়ত আমাদের উপব বুঝি তুমি রাগ করেছ।"

পিসিমাতা সেই মাতুরীতে বসিয়া—তাঁহার গুলের কৌটা হইতে এক টিপ গুল্ মুখে দিয়া বলিলেন—"আস্‌তে সময় পাই কই বউ? তা যত মনে করি, কারুর কথায় আর থাক্‌বো না, তা পোড়া ব্রহ্মণ্যি-দেব, যেন আমাকে ঘুর্ণো-বাতাসের মুখে, কুটোর মত পরের চর্চ্চার ভেতর, উড়িয়ে এনে ফেলে।"

বিন্দুবাসিনী একথা শুনিয়া একটু তটস্থ হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, আজ রুদ্রাণী দেবী নিশ্চয়ই কোন কিছু নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাহা না হইলে, সহসা এরূপ সাংঘাতিক ভূমিকা আরম্ভ করিবেন কেন?

এজন্য তিনি পিসিমার মনটিকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য, বলিলেন—"তাকি আর জানি না—ঠাকুর ঝি? কিন্তু পরের জন্য তুমি যতটা ভেবে মর, পরে তোমার জন্য এতটা ভাবে না।"

পিসিমা এ প্রশংসাবাদে বড়ই খুসী হইয়া বলিলেন—"বল্ বৌ!" ধর্ম্ম কথা কইতে আটক নেই। তোর মুখে ফুলচন্নন পড়ুক।

ঠিক এই সময়ে, একটা টিক্‌টিকি জানলার ফাঁকের মধ্য হইতে গলা বাড়াইয়া, তিনবার "টিক্‌টিক" শব্দ করিল।

পিসিমা তিনটী তুড়ি দিয়া বলিলেন—"সত্যি—সত্যি—সত্যি!" হাঁ ভাল কথা, ও বাড়ীতে খুব মজা বেধে গেছে!"

বিন্দু। কোন বাড়ীতে ?

পিসিমা। ঐ তোমার জমীদার বাড়ীতে আর কোথায় গো ! লক্ষ্মী-ভাগ্যি থাক্‌লেই, কি লোকে সুখী হয় বৌ ? থাকলেই বা টাকা। এ সংসারে টাকা আর সুখ, দুটো আলাদা জিনিস।

বিন্দু। তাতো ঠিক কথা ঠাকুরঝি। তা ও বাড়ীতে আবার হলো কি ?

পিসিমা। ঐ যে পেসন্নর পরিবারটী দেখছো—ওটী একটী আস্ত রায়বাঘিনী। ভাগ্যে তুমি ওদের বাড়ী যাওনি বৌ ! তাহলে আমাকেই একটা নিমিত্তের ভাগী হতে হতো।

বিন্দু। হাঁ—বিরজার কথা গুলো একটু রুক্ষ বটে !

পিসিমা। খালি তাই। মনটা আরও পেঁচাল। তোমাদের ও বাড়ীর ছোটবৌ, কালনাগিনী সাপের মত দেখ্‌তে খুব চটক দার বটে, কিন্তু ভেতরে কালকুটের ঢেউ খেল্‌ছে। এই ধর না পেসন্নর ও পক্ষের একটা বিধবা মেয়ে আছে। অমন ঠাণ্ডা মেয়ে এ তল্লাটে নেই। তার পর পোড়া ভগবান, কিনা তার কপাল পুড়িয়েছেন। তা—তাকে একটু দেখা শোনা, আয়িত্তি মমতা করা দূরে থাক, দুটো মিষ্টি কথা বলা চুলোয় যাক, তারও পর্য্যন্ত হিংসে করে। তার শ্বশুরের বিষয় কত। তারা হচ্ছে,কল্‌কেতার জমীদার। দু দুখানা বাড়ী কলকেতায়। পাড়াগাঁয়ের ভিতরে রাজার পুরীর মত বাড়ী ঘর আর জমীদারী। তা রাজা বল্লেই হয় ! অমন সাতটা পেসন্নর বিষয় জোড়া দিলে তাদের অর্দ্ধেকও হয় না।"

বিন্দু। সত্যি ঠাকুরঝি—অপি আমাদের রূপে গুণে সমান।

আহা! কি কষ্ট বল দেখি দিদি! এই বয়সে বাছার সিঁথের সিন্দুর মুছে গেল। এ কথাটা ভাবতে গেলে, গা শিউরে উঠে। অমন রাজা শ্বশুর—মায়ের মত শাশুড়ী। বৌ মা বলতে শাশুড়ী—অজ্ঞান। কিন্তু সেখানে গিয়ে ত অপি বেশীদিন থাকতে পারে না।

পিসিমা। সত্যিই তাই। কিন্তু ও কি করবে বল! আহা সেখানে গেলে—মেয়েটা যেন বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট করে। সব কথাই যে ওর মনে পড়ে গা। মোটে ত পাঁচবৎসর বে হয়ে ছিল। ওর জন্যে শ্বশুর-শাশুড়ী মাছ ত্যাগ করেছে। বাড়ীতে মাছ ঢোকবার হুকুম নেই। তারপর শাশুড়ীর ইচ্ছে, যে অন্ততঃ হাতে চুড়ী ক'গাছাও রাখে। থান কাপড়টা না পরে। তা এমন একগুঁয়ে মেয়ে, কিছুতেই তা করবে না। তাদের যে ঐ মুর্ত্তি দেখলে বুক্ কেটে যায়! হাঁ—তারপর শোন। কি একটা ব্রত ছিল, সেটা উজ্জাপন হবে। তার শ্বশুর হপ্তা খানেকের জন্য তাকে নিয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে পেসন্নর গিন্নি এক কাণ্ড করে ফেলেছে!

বিন্দু। কাণ্ডটা কি?

পিসি। গিন্নিত আঁতুড়ঘর থেকে তিনমাস বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু গতর আর তাঁর বয় না। একটা রাঁধুনী বামনী, তিনটে ঝি, দোতোলায় ভাতের থালা উঠে, তবু বলেন—"খেটে খেটে হাড্ডি সার হলুম।" এই জন্য তার মাকে দুমাস হ'লো আনিয়েছে। আর তার সঙ্গে তার একটা হতচ্ছাড়া ভাইও এসে ভগ্নিপতির—অন্ন ধ্বংসাচ্ছে। সেই শালা বাবুর নবাবী দেকে কে? খাঁদাপুতের নাম যেন পদ্মলোচন। তারপর মেয়ের চেয়ে, মা আবার এক কাটি সরেস।

সে দিন আমার সঙ্গে মাগীর খুব এক চোট্ হয়ে গেছে। অমন দজ্জাল মেয়ে মানুষ, আর আমি কখন দেখিনি ভাই!"

কমলা, আহারান্তে রাখালের মার বাড়ীতে সে দিন বেড়াইতে গিয়াছিল। কেবল বেড়ান উপলক্ষে যাওয়া,তার উদ্দেশ্য নয়। সে দিন সে উচ্ছের সুক্ত, লাউয়ের ডালনা, প্রভৃতি কয়েক খানি ভাল ভাল তরকারি রাঁধিয়া ছিল। তাহারই একটু একটু রাখালের মাকে দিতে গিয়াছিল। কেননা রাখালের মা—কমলার হাতের রান্না খাইতে খুব ভালবাসে।

কমলা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—রুদ্রপিসি ও তাহার মা বেশ্ আড্ডা জমকাইয়াছেন। সে তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

রুদ্রপিসি বলিলেন—"তার পর শোন বউ! ছন্নপড়া মাগীর তেজ দেখে কে? খেতে পেতোনা—জামায়ের সংসারে এসে এখন ষোল আনা গিন্নি হয়েছে। হলে কি হবে, আকরের দোষতো যায় না ভাই? পেসন্নর দশা এমন করেছে, সে সে আমলই পায় না। নিজের সংসারে—যেন সে চোর। সেই গুণধর ভাই পেসাদ নাকি আবার পেসন্নর নায়েব হয়ে, মফঃস্বলে গেছে। এ পাড়ায় আমাকে সবাই খাতির করে। আমি সেদিন ওদের বাড়ী বেড়াতে গেলুম—পেসন্নর শাশুড়ী কিনা ঠেকারে কথা কইলে না। তা যদি আমি রুদ্দুর বামণী হই—ঐ দজ্জাল শাশুড়ীর হাতে পড়ে শেষে দেখো পেসন্নর হাড়ির হাল হবে। আর মাগীকেও ঝাঁটা খেয়ে ও বাড়ী থেকে বেরুতে হবে। মাগির ছেলেটা শুনছি, নেশাখোর বদমায়েস।

গাঁজা, আফিম, মদ সব তাতে চৌকোষ। তার উপর গেরস্তের বৌ-ঝির দিকে উঁচু নজর দেওয়া রোগও আছে।”

বিন্দুবাসিনী ভাবিলেন—“নিশ্চয়ই রুদ্রাণী, কোন কিছু জিনিস পত্র, বিরজার মার কাছে চাহিয়াছিল তাহা পায় নাই বলিয়া এত নিন্দাবাদ। আর কমলা কথার শেষটা শুনিয়া ভয়ে চমকিয়া উঠিল।

অপর্ণা যে পাঁচসাত দিনের জন্য, ব্রত উদ্‌যাপন করিতে তার শ্বশুরবাড়ী যাইবে, সে সংবাদ কমলা অপর্ণার কাছেই পাইয়াছিল। সে জানিত—আশাভঙ্গে, আড়ালে নিন্দা করাই রুদ্রপিসির জীবনের ব্রত। তিনি যে কখন কার উপর সদয়, কার উপর নিদয়, তাহা বোঝা বড়ই শক্ত কথা।

পিসিমা—ঠাকুরাণী, এ পর্য্যন্ত বহুদিনের পুরাণো এই পারিবারিক সংবাদটী কাহারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু অপমানের জন্য তাঁহার মনের মধ্যে আগ্নেয়গিরির রুদ্রজালাময়ী অনলতরঙ্গের মত একটা অগ্নিস্রোত বহিতেছিল। বিন্দুবাসিনীকে কথাটা বলিয়া ফেলায়, তাঁহার মনের ভারটা অনেক কমিয়া গেল।

বিন্দুবাসিনীর সিদ্ধান্তই ঠিক্। আমরা ভিতরের সব কথাই জানিতে পারি—কেননা আমরা গ্রন্থকার। রুদ্রপিসি—একদিন বিরজার মার নিকট একটু তেল ও কিছু মুগের দাল চাহায়, সে বলিয়াছিল—“পরের সংসারে আমি আছি বাছা। কোন কিছু দেওয়া-থোয়ার অধিকার ত আমার নেই। বিরজা জান্‌তে পাল্লে, ভারি বেজায় হবে।” এই প্রত্যাখ্যানেই এতটা আগুন ধরিয়া গিয়াছে।

(১২) শল আনা অনুরাগের

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, প্রসন্নকুমারের
জন্য, তাঁহার মনে একটুও সুখ স্বচ্ছন্দ ছিল ন. র্ব্বের কতকগুলি কথা
রূপসী পত্নী দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পত্নী জননীর চিত্র, আরও
দুর্ম্মুখ পত্নীর বাক্যযন্ত্রণায়, তিনি মধ্যে মধ্যে রজার পিতার অবস্থা
খুবই একটা অস্বচ্ছন্দ ভোগ করিতেন। ন্দরী বলিয়াই, তিনি
গা-ভরা গহনা, পেটিকাভরা একরাশ দ ান। কিন্তু তাঁহার
ভালবাসা, দিনরাত টাকা লইয়া নাড়াচাড়া, এ সময় তিনি যে দুই
মন উঠিত না। তাহার মনের কেমন একা দিয়াছিলেন—বা
অপরের নিশ্বাস, একটুও সহ্য করিতে পারিত ছিলেন, সবই তিনি
বালবিধবা অপর্ণা, পিতৃগৃহেই বেশী দিন থাকি দায় করিয়াছিলেন।
থাকিবার কারণ, পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। প্রসন্নকুমারের শ্বশুর
গেলে সে স্মৃতির জ্বালায় জ্বলিয়া মরিত। শ্বশু ল্য—তাঁহার শ্রাদ্ধে
বিধবার সুখস্বচ্ছন্দের জন্য, সকল প্রকার বন্দোব মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে
ছিলেন। শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বৌমা বলিতে অজ্ঞা হইলে, তাহা বড়
তবুও অপর্ণা বেশীদিন শ্বশুরবাড়ী থাকিতে পারিত চেষ্টায়, আর প্রসন্ন-
থাকিত, কেবল নির্জ্জনে কাঁদিত। তাহার দেবচ পাঁচ শত টাকার
খানি তৈল চিত্র, তাহার কক্ষে টাঙ্গানো ছিল।
চাহিয়া; সে অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিত ঙ্গকে আষ্টেপৃষ্ঠে
ঠাকুরাণী বহুবার পুত্রবধুর এই অবস্থা গোপনে লক্ষ তখন তাঁহার
কিন্তু কোন উপায় নাই। তাঁহারাও তাঁহাদের অ প্রসাদের দিকে
এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া. অশ্রুধারায় বুক ভ সন্নকুমার তাঁহার

প্রকৃত বিরক্তি চাপিয়া রাখিয়া, বাহিরে ষোল আনা অনুরাগের ভাবই দেখাইতে।

বিরজা জননীর জামাতৃগৃহে আসিবার, পূর্ব্বের কতকগুলি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। তাহাহইলে বিরজা-জননীর চিত্র, আরও পরিস্ফুট হইয়াউঠিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিরজার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁহার কন্যা বিরজা খুব সুন্দরী বলিয়াই, তিনি জমীদার জমাই করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গ্রামের দুষ্ট লোকে নাকি রটাইত, কন্যাদানের সময় তিনি যে দুই চারিখানা অলঙ্কার দিয়া কন্যাকে সাজাইয়া দিয়াছিলেন—বা বিবাহের রাত্রে যাহা কিছু খরচপত্র করিয়াছিলেন, সবই তিনি তাঁহার ধনী জামাতার নিকট হইতে গোপনে আদায় করিয়াছিলেন।

বিরজার বিবাহের এক বৎসর মধ্যেই, প্রসন্নকুমারের শ্বশুর মহাশয়, পরলোকে যাত্রা করেন। বলা বাহুল্য—তাঁহার শ্রাদ্ধে খুব জাঁকজমক হইয়াছিল। সেকালে পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চারি পাঁচ শত টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ হইলে, তাহা বড় কম একটা ব্যাপারে দাঁড়াইত না। বিরজার চেষ্টায়, আর প্রসন্ন-কুমারের গোপনে প্রদত্ত অর্থে, এই শ্রাদ্ধটীতে পাঁচ শত টাকার উপর পড়িয়া গিয়াছিল।

বিরজা যখন রূপের আটাকাটীতে, প্রসন্ন-বিহঙ্গকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া, তাহাকে নিজের আয়ত্বে আনিলেন, তখন তাঁহার করুণ দৃষ্টি, এই বিধবা মাতা আর অপোগণ্ড ভাই প্রসাদের দিকে পড়িল। বিরজার অনুরোধ আর জেদে পড়িয়া, প্রসন্নকুমার তাঁহার

শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর দিন চলিবার জন্য, দেবসেবার বন্দোবস্তের মত মাসিক তেল—ঘি, চাউল দাউলের খরচ বরাদ্দ' করিয়া দিলেন। তাঁহা ছাড়া বিরজা মাঝে মাঝে জিনিষটা পত্রটা, কাপড়টা চোপড়টা, পাঠাইয়া মাতাকে তত্ত্বতাবাস করিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীমান প্রসাদ, ভগ্নিপতির সংসারে আসিয়া একটী ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিয়াছিল। অবস্থাটা এমনই হইয়াছিল, যে মোটাকাপড় পড়িলে এখন তাহার কোমরে লাগে, ভাল ইস্ত্রি-করা সার্ট না পরিলে, তাহার লজ্জা বোধ হয়। চকচকে বার্ণিস করা বেশী দামের জুতা না হইলে, তাহার অবাধগমনের ব্যাঘাত হয়। কোমল অঙ্গুলিতে কড়া পড়ে। এই সব নানা রকমেব অছিলা ভগ্নির নিকট তুলিয়া, সে তাহার বেশভূষার বিচিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রকৃত "শালাবাবুতে" দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, বিরজা তাহার এই গুণধর ভাইয়ের বাবুগিরির সখ মিটাইবার জন্য যে টাকা দিত, তাহা নানা অছিলায় প্রসন্নকুমারের কাছেই আদায় করিয়া লইত। তার পর ভগ্নীর চেষ্টায় মহলের নায়েব হইয়া মফঃস্বলে গিয়া, প্রসাদ তাহার বাবুয়ানাটা পুরা মাত্রায় জাঁকাইয়া তুলিল।

লাগে টাকা—দেবে গৌরীসেন! কাজেই প্রসাদ সরকারী তহবিল স্বচ্ছন্দ ব্যয় করিয়া, বাবুগিরি করিতে লাগিল। আহারের সময় মাছের মুড়াটা তাহার ঝোলের বাটীর মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। দুধের সরটুকু হইতে, গাওয়া-ঘি তৈয়ারী হয়। তাহাই তাহার প্রথম অন্নগ্রাস গ্রহণের রুচি বৃদ্ধি করে। ক্ষীরের মত দুধ ঘন করিয়া জ্বাল না দিলে, সে দুধের বাটী

ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। রান্না খারাপ হইলে—রসুইয়ে বামুনের মাহিনা কাটে, ঝিকে গালাগালি দেয়। গোমস্তাদের মুখ খিচায়। বাঁকতুলসী রূপশাল চালের ভাত না হইলে, তাহার আহার হয় না। পেটে শূলবেদনা ধরে। মফঃস্বলের নায়েবরূপে আবির্ভাব হইবার পর, এই সব বাবুয়ানা উপসর্গ এক মাসের মধ্যে এই প্রসাদ বাবুর উপর শক্তিবিকাশ করিল।

এ সংবাদও আমরা রাখি, যে প্রসাদবাবু, ভগ্নিপতির গৃহে শুভাগমনের পূর্ব্বে, বাড়ীতে বৈকালে জলদেওয়া ভাত খাইতেন। কারণ বৃদ্ধা মাতা, দুই বেলা রাঁধিতে পারিতেন না। কিন্তু ভগ্নিপতির বাটীতে রাত্রে ফুলকো লুচি, গরম গরম মাছের কালিয়া, ডিমওয়ালা আস্ত বাটা মাছ ভাজা না হইলে, তাঁহার আহারেব কষ্ট হইত। তার পর মফঃস্বলে জমীদারির নায়েব-রূপে নিযুক্ত হইবার পর, কাঁচা পয়সার অভাব রহিল না। দুই মাসের মধ্যে নায়েব-মশাই প্রসাদ বাবু, যেরূপ চাল-চলন আরম্ভ করিলেন, তাহাতে বহুকালের পুরাণো গোমস্তা কারকুনেরা, চমকিয়া উঠিল। তাহারা বুঝিল—ছয়মাস এই ভাবে চলিলে, লাট কিস্তির গায়ে ঘা পড়িবে। কিন্তু জমীদার প্রসন্নকুমারের আদরের শালাবাবুর কাজের উপর কথা কহিবার কোন শক্তিই নাই তাহাদের।

(১৩)

"কে বাড়ীতে আছ গা?"

একদিন স্বর্গীয় রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের অর্থাৎ কমলাদের

বাটীর দ্বারে মৃদুভাবে করাঘাত করিয়া, একজন ডাকিতেছিল—"কে বাড়ীতে আছ গা ?"

গৃহিণী ও কমলা, আহারান্তে সবে মাত্র বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন, এমন সময় এই আহ্বান শব্দ তাঁহাদের কাণে পৌছিল।

গৃহিণী বলিলেন—"কে দেখ দেখি কমলা ?"

বহুদিন শোনা না থাকিলেও, সে স্বর কমলার কর্ণে যেন চির পরিচিত বীণার ধ্বনির মত প্রতিধ্বনিত হইল। সে নড়িল না।

মা বলিলেন—"দোরের কাছে গিয়ে দেখ্ না কম্‌লি ?"

কম্‌লি তবুও নড়িল না। তার উপর আবাব সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। অবস্থা দেখিয়া, গৃহিণী সন্দিগ্ধচিত্তে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া বলিলেন—"কে গা তুমি ?"

বাহিরে যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল—"সে বলিল আমি গোবিন্দ।

তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিয়া, বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"এস বাবা এসো। আমার লাখ্ টাকার ধন এসো! এমন করে কি হতভাগিনী মাকে ভুলে, এতদিন থাক্‌তে হয় ?"

পাঠক্ ইহাঁকে চিনিতে পারিয়াছেন কি ? ইনিই সেই হাটের ময়রার দোকানের সন্দেশভোজী ব্রাহ্মণ। স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। সেদিন তিনি অসুবিধা বুঝিয়া, সেই হাটের পরবর্ত্তী গ্রামে, এক শিষ্যবাড়ীতে আতিথ্য-স্বীকার করায়, শ্বশুরবাড়ীতে না গিয়া সেখানেই দিন চারেক কাটাইছিলেন। শিষ্যালয়ে একটা ব্রত ছিল। তাহাতেই তাঁহার দেরী হইয়া গিয়াছিল। আর এজন্য তিনি চারিদিন পরে আবার শ্বশুরালয়ে দেখা দিয়াছেন।

গোবিন্দ, শাশুড়ীর পদধুলি গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণে পদস্পর্শ করিয়াছে—সে জামাই হইলে কি হয়—ভাবিয়া, বিধবা তাঁহার কপালে যুক্তহস্ত ঠেকাইয়া, ব্রহ্মণ্যদেবকে মনে মনে প্রণাম করি-লেন। তার পর সদর দ্বার ভেজাইয়া দিলেন।

তাড়াতাড়ি দালানে গিয়া একটী ভাল সপ্ বিছাইয়া, একখানি পাখা লইয়া, তিনি জামাতাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। গোপাল গোবিন্দ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল—"ও কি! আপনি বাতাস কচ্ছেন কেন? আমার যে পাপ হবে।" জামাতা ইত্যাকার ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিলেও, গৃহিণী তাহা কাণে তুলিলেন না।

বাটীর সম্মুখে একটী বাঁধা ঘাট ছিল। এ ঘাটে পা ধুইয়া আসিলেও, গোবিন্দ ঠাকুরের পায়ের কাদা সম্পূর্ণরূপে ধুইয়া পরিষ্কার হয় নাই। তাহা দেখিয়া গৃহিণী কমলাকে জল আনিতে বলিলেন। মাতৃআদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই, ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া, কমলা গাড়ু ভরিয়া, খিড়কীর পুকুর হইতে জল আনিয়া, তাহা দালানে রাখিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া, গৃহিণী ব্যজন ত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

তারপর কমলা, অবগুণ্ঠনটা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া, স্বামীর পা ধোয়াইয়া, অতি ভক্তিভরে গামছা দিয়া পা দু'খানি মুছিয়া দিল।

কমলা এই অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে, স্বামীর মুখ দেখিতে-ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু যখন সে দক্ষিণ হস্তখানি দিয়া, সেই ফাটাপায়ের কাদা পরিষ্কার করিতেছিল, তখন চম্পকাঙ্গুলির সুন্দর কান্তি দেখিয়া গোপাল ঠাকুর বুঝিলেন, তাঁহার

পত্নী কমলা, সত্যসত্যই রূপেগুণে কমলা। তাঁহার কোন পত্নীই এরূপ রূপসী নহে।

গোপাল জানিত না, সে একদিন যাহাকে কোরকরূপে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত দেখিয়া সে চলিয়া গিয়াছিল, আজ সেই কোরক, পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সে দেখিয়া গিয়াছিল, প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্রজ্যোতি। এখন সে দেখিল ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদ।

কমলা তখনই তাহার মস্তক ভাল করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত করিল। কিন্তু তাহা করিবার সময় লজ্জায় তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। সে গাড়ুটা যথাস্থানে রাখিয়াই, ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করিল।

কুলীন জামাই গোপাল গোবিন্দ, কমলার সে স্থান ত্যাগ করিবার পর ভাবিতে লাগিল—"হায়! এমন যে, তাহাকে আমি কেন এত দিন ভুলিয়া ছিলাম? আমি ত আরও দুই সংসার করিয়াছি, তাহারাও ত কুৎসিং নয়। কিন্তু কই কেহ ত ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

তার পর গোপাল অনুতপ্তহৃদয়ে মনে মনে বলিল—"আমি আজ টাকার প্রয়োজনে, ইহাদের বাটিতে আসিয়াছি। পত্নী-সন্দর্শনে আসি নাই। কিন্তু যদি এরা আমার কৌলীন্য-মর্য্যাদার উপযুক্ত টাকা না দিতে পারে? তাহা হইলে কি আমি রুষ্টভাবে এ স্থান ত্যাগ করিতে পারিব? এই সময়ে কমলা আবার সেখানে দেখা দিল।

গোপাল অস্ফুটস্বরে বলিল—"ভাল আছতো কমলা?"

কিন্তু লজ্জাশীলা কমলা, কেবল মাত্র ঘাড় নাড়িয়া স্বামীর এ

প্রশ্নের উত্তর দিল। গোবিন্দের তখন ইচ্ছা হইতেছিল, একবার এই ঘোমটাটী স্বহস্তে সরাইয়া, কমলার মুখখানি ভাল করিয়া দেখেন। কিন্তু কমলা একটু দূরে দাঁড়াইয়া থাকায়, আর পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে সে সুবিধা ঘটিল না।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী, ইতিমধ্যেই খিড়কী দ্বার দিয়া রাখালদের বাড়ীতে গিয়া, রাখালের বাপের হাতে একটী টাকা দিয়া বাজার হইতে কিছু মিষ্টান্ন ভাল তরীতরকারী, আর মাছ আনিবার ফরমায়েস করিয়া আসিলেন।

বাড়ীতে বাতাসা বই আর কিছু ছিল না। এজন্য গৃহিণী তাড়াতাড়ি বাতাসা ভিজাইয়া, একটু সরবত তৈয়ার করিয়া জামাতার কাছে ধরিয়া বলিলেন—"সন্ধ্যে-আহ্নিক হয়েছে ত বাবা! এই সরবত টুকু খাও।"

শিষ্যবাড়ীতে সন্ধ্যা আহ্নিক ও সামান্য জলযোগ করিয়া গোপাল গোবিন্দ শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি পথশ্রমে বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত। এজন্য সরবৎটুকু শেষ করিয়া, ব্যাগের মধ্য হইতে হুঁকা কলিকা তামাক ইত্যাদি বাহির করিলেন।

বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"আসবে বলে একটা খপর দিতে হয় বাবা! দেখ দেখি কত বেলা হয়েছে। ভাত চাট্টি চড়িয়ে দিইগে।" বলিয়া গৃহিণী রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

স্বামী নিজের হাতে তামাকু সাজিতেছেন—কমলা এটা সহ্য করিতে পারিল না। রান্নাঘর পশ্চিম দিকে। যেখানে বসিয়া তাহার স্বামী তামাকু সাজিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, রান্নাঘর

হইতে সে স্থানটা দেখা যায় না। এজন্য কমলা ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, সেই কলিকাটী লইয়া তামাকু সাজিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

গোবিন্দ শশব্যস্তে বলিলেন—"কর কি! কমলা কর কি? ও সব তোমরা জাননা। দাও আমাকে-আমি সাজিয়া লই। তুমি বরঞ্চ একটু আগুণ আন।"

কমলা স্বামীর এ অনুযোগ শুনিল না। সে পরিপাটিরূপে তামাকু সাজিয়া, আগুণ আনিতে রান্নাঘরে গেল। তার পর কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে দালানের কাছে আসিল।

ফুঁ দিবার জন্য, তাহার মুখের অবগুণ্ঠনটা নাকের উপর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। এবার গোপাল গোবিন্দ তাঁহার পত্নীর সুন্দর মুখের অস্ফুট আভাস দেখিতে পাইলেন।

এমন সময়ে পবনদেব তাঁহার সহায়তা করিলেন। সহসা বাতাসে অবগুণ্ঠনটা সরিয়া যাওয়ায় গোবিন্দ দেখিলেন—"যেন শরতের প্রোদ্ভিন্ন শতদলের উপর, কে যেন এতক্ষণ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

গোপাল মনে মনে বলিলেন—আমার টাকা বড় না এই রূপসী পত্নী বড়। আমার ঘরে যাহারা আছে, কই তাহারা ত এতটা সেবা যত্ন আমার করে না। এত ভক্তি করে না, এত আদরও করে না। স্নেহযত্ন বড়—না টাকা বড়? মনুষ্যত্ব বড়—না হীনতা বড়? রূপার চাকতির উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বড়—না পতিব্রতার স্নেহ-সমুজ্জ্বল মমতামাখা নেত্রেরজ্যোতিঃ আরও সমুজ্জ্বল?
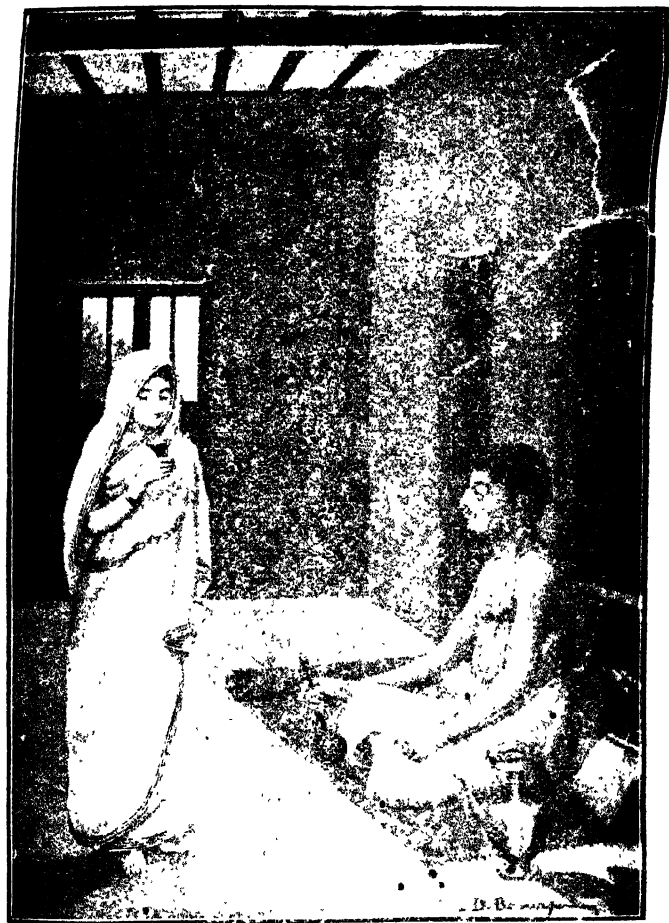
গোপাল মনে মনে বলিলেন —"আমার টাকা বড়, না এই
রূপসী পত্নী বড় ?"

৮২ পৃষ্ঠা

কমলা মাতার আহ্বানে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য, পাকশালার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে খুবই একটা ইচ্ছা হইয়াছিল, সে তাহার পথশ্রান্ত স্বামীর, শ্রমক্লিষ্ট পা দুখানি একটু টিপিয়া দেয়। পাখা লইয়া তাঁহাকে আরও একটু বাতাস করে। কিন্তু সে তাহা করিবার উপযুক্ত অবসর পাইল না।

দালান হইতে চলিয়া যাইবার সময় সে মনেমনে ভাবিল—"মা এই বৃদ্ধবয়সে রন্ধনশালায় কষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাকে সাহায্য করাই তার প্রথম কর্ত্তব্য। আর এদিকে বেলা হইয়া পড়িতেছে। সদানন্দও বাজার হইতে তখনও ফেরে নাই। তাহাকে হয়তো মাছ রাঁধিতে ও কুটনা কুটিতে হইবে, দুধ জ্বাল দিতে হইবে—অনেক খুঁটিনাটির কাজ তাহার হাতে।

কমলা সহসা চলিয়া যাওয়ায়, গোপালগোবিন্দ তাহার সহিত দুটা কথাবার্ত্তা কহিতে না পাইয়া, মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু যখন তিনি ভাবিলেন তাঁহার বৃদ্ধা শাশুড়ী একা রন্ধনশালায় গিয়াছেন, তাঁহাকে সাহায্য করা কমলার খুবই প্রয়োজন—তখন তিনি ক্ষণকালের জন্য কমলার চিন্তা ত্যাগ করিয়া আবার হুঁকাটী লইয়া ধূমপানে মনোযোগ দিলেন।

প্রত্যেক টানের সময়, নলের মুখ হইতে যেমন কুণ্ডলীকৃত ধুঁয়া বাহির হইতে লাগিল, তৎ সঙ্গে গোপালের মনেও নানাবিধ চিন্তার লহরী উঠিল।

গোপাল মনে মনে ভাবিতেছিলেন—"দুই বৎসর পরে আমি এ বাটীতে আসিয়াছি। এই দীর্ঘকাল মধ্যে কমলার এতই পরিবর্ত্তন ?

সেই মুদিত শতদল সমতুল্য মধুর মাধুরী আজ যে দেখিতেছি, পূর্ণ ভাবে বিকশিত। যে দুই পত্নী লইয়া আমি ঘর কন্না করি, তাহারা বড়ই মুখরা, অত্যধিক কলহপ্রিয়া। দুইজনকে এক সময়ে আমার বাড়ীতে রাখিলে, প্রায়ই রণারণি বাধাইয়া দেয় বলিয়া, আমি তাহাদের দুইজনকে কখনও একত্রে রাখিতে সাহস করি না। ছয় মাস করিয়া এক একজনকে সংসারে থাকিতে দিই। তাহাদের যত্ন নাই, সেবা নাই, কেবল আছে খুঁটিনাটি লইয়া আত্মবিবাদ। কিন্তু তাহাদের পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া, আমি যদি এই কমলাকে লইয়া ঘরসংসার করি, তাহাহইলে কি সংসারজীবনে একটু বেশী সুখী হইতে পারি না?

তারপর তাঁহার দ্বিতীয় চিন্তা—সেটা অতি কষ্টদায়ক। তাহা যেন তাহার প্রথমে কল্পিত সুখের চিন্তাসূত্রকে, একাবারে ছিন্নবিছিন্ন করিয়া দিল। সেটা—রূপেয়ার ভাবনা।

এ সংসারে রূপ আর রূপেয়া লইয়াই, চিরদিনই অনর্থ বাধিয়া আসিতেছে। গোপালের মনে কমলার রূপের ছায়াটা একটু বেশী আধিপত্য বিকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু রূপেয়ার চিন্তা আর দায় দেনার ভাবনা, সহসা তাহার মনে জাগিয়া উঠায়, প্রথমের সেই সুখচিন্তাটী একবারে ডুবিয়া গেল।

সত্যসত্যই কিছু রজতখণ্ড সংগ্রহের জন্যই, গোপালগোবিন্দ এই দুই বৎসর পরে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৎসর হাজা-শুখা হইয়াছে, তার জন্য ধান-চাল ভাল হয় নাই। সামান্য জমীজমা যাহা কিছু বিলি করা ছিল, তাহার খাজনাও আদায় হয়

নাই। অকাল বলিয়া শিষ্য-যজমানের বাড়ীতে সে বৎসর কোন ক্রিয়া কর্ম্মও ছিল না। তাহার উপর জমীদারের সরকারে দেয় দুই সনের টাকা—এখনও মায় সুদ উসুল করা হয় নাই। তাহার জন্য নায়েবে, নালিশের ভয় পর্য্যন্ত দেখাইতেছে। তাঁহার একমাত্র ভগ্নির বিবাহের জন্য, কিছু বাজারদেনাও করিতে হইয়াছিল। সে দেনাটাও সুদেসুদে তস্য সুদে অনেক টাকা হইয়া গিয়াছে। মহাজন তাহারও জোর তাগাদা করিতেছে। নালিশ করিলেই হয়।

এই সব ভাবনায় অধীর হইয়াই—গোপাল ঠাকুর সর্ব্ব প্রথমে শিষ্যবাড়ীতে কিছু রুধির সংগ্রহ চেষ্টায় গিয়াছিলেন। তবে সেখানে যাহা কিছু আদায় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আশানুযায়ী হয় নাই।

(১৪)

আকাশে জলভরা মেঘ দেখিলে, চাতকীর মনে কিরূপ, আর কতটা, আনন্দ হয়,—তাহা সেই চাতকীই ঠিক বলিতে পারে। আর কবির উপমায়, নিরাশের আশাতৃপ্তির ইহা একটী শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সে দিন স্বামীকে সহসা সমাগত দেখিয়া কমলার মনে, বোধ হয় মেঘ প্রত্যাশিতা তৃষিতা চাতকিনীর মত, একটা আনন্দ হইয়াছিল।

যে চিরবাঞ্ছিত, সে আজ নারায়ণরূপে তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছে। যে দূরে ছিল, সে খুব কাছে আসিয়াছে। বামনে আকাশের চাঁদ স্পর্শ করিতে পারিলে—ভক্ত দেবপ্রতিমার চরণ

ছুঁইতে পারিলে মনে ভাবে, তাহার একটা অসম্ভব আশা পূর্ণ হইল। আজ কমলার পক্ষে তাহারই মত কোন কিছু একটা হইয়াছে।'

সে কালের কুলীনজামাই শ্বশুর বাড়ীতে আসিলে, তা শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কুলীন হউন বা শোত্রিয় হউন, কৌলিন্য মর্য্যাদাস্বরূপ কিছু না কিছু রজতমুদ্রা পাইতেন। বল্লালসেন আর দেবীবর ঘটক, কুলীনের কুলীনোচিত গুণাবলীর জন্য, যে বেজায় সম্মান বাড়াইয়া গিয়াছিলেন, সুদূর ভবিষ্যতে তাহা এক অতীব শোচনীয় ব্যাপারের সূচনা করিয়াছিল।

সেকালে কুলীন—জামাই বাড়ীতে যতবার আসিতেন, তাঁহাকে প্রতিবারেই কৌলীন্যমর্য্যাদা দিতে হইত। আমরা অতিরঞ্জিত কথা বলিতেছি না। পা-ধোবার মর্য্যাদা, আহারের মর্য্যাদা, শ্বশুরবাড়ীতে রাত্রিবাসের মর্য্যাদা, ইত্যাদি ব্যাপারে, এই জামাতা বাবাজিরা অন্ততঃ বিশপঁচিশ টাকা বা ততোধিক আদায় করিতেন। আজকাল যেমন দুই হাজার আড়াই হাজার অথবা তিন হাজার বা তদূর্দ্ধ—পরিমাণ চকচকে টাকা, দানের থালায় সাজাইয়া না দিলে, কন্যার বিবাহ হয় না, সেকালে, কুলীন-জামাইকে অন্ততঃ পাঁচ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া যত উর্দ্ধে পারা যায় মর্য্যাদা স্বরূপ রজত মুদ্রা না দিলে, জামাই শ্বশুরবাড়ী রাত্রিবাস করিতে স্বীকৃত হইতেন না। পাঠক যেন মনে না ভাবেন এতদিন পরে এসব পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া, অধঃপতিত কুলীনের উপর লুপ্তপ্রায় শ্রদ্ধা আর বাঙ্গালীর একটা অতীত কলঙ্কের কথা জানাইবার

জন্য, আমরা এসব কথা বলিতেছি। তবে তখন যাহা ছিল, তাহার একটু ক্ষীণ আভাস এই স্থানে দিয়া রাখিতেছি মাত্র।

বড় মানুষের বাড়ী হইলে কথাই নাই। কিন্তু গরীব গৃহস্থের বাড়ীতে জামাই আসিলে, সেকালে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দেরই সঞ্চার হইত। কেননা, গরীবলোকে, অনেক সময়ে কুলীনের মানের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে, অসমর্থ হইত! ইহাতে জামাতা বাবাজী হয়তো রাগ করিয়া, শ্বশুরবাটীতে অন্নগ্রহণ ও রাত্রিবাস পর্য্যন্ত করিতেন না। হয়তো—সেই রাত্রেই অতি পাষণ্ডের মত সাধ্বী পত্নীর চোখে জল বহাইয়া, গুরুজনের মনে ব্যথা দিয়া, সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতেন। কি নিষ্ঠুরতা! কি বর্ব্বরতা! কি হৃদয়হীনতা!

আর এখনকার এই উন্নতির দিনে, বিংশশতাব্দীতে এরূপ একটা নিষ্ঠুর প্রথা প্রকারান্তরে প্রচলিত নাই কি? আছে বই কি? তবে অনেকটা রকমফেরে ও পরিবর্ত্তিত অবস্থায়। আমরা আজকালকার সমাজে এটুকুও দেখিয়াছি, অনেক জামাতা, গরীব শ্বশুরের তত্ত্ব-তাবাসে বিরক্ত হইয়া, তাঁহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন! ছেলের বাপ মা, হয়তঃ ছেলেকে তাহার শ্বশুরের অসমর্থতা এবং অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য, শ্বশুরবাড়ীতে পাঠান না। কিম্বা বধূকে বাপের বাড়ীতে আসিতে দেন না।

যাক্—বর্ত্তমান ও অতীতের তুলনায় সমালোচনের প্রয়োজন এখন নাই। সমাজের সকল যুগে, সকল স্তরে, ভাল মন্দও দুইই থাকে। ইহা আবহমানকাল প্রচলিত প্রথা।

বিন্দুবাসিনীর অনুরোধে, সদানন্দ তেলী গাঁয়ের বাজারে যাহা

কিছু ভাল জিনিস মেলা সম্ভব—তাহা আনিয়া দিল। আর সব জোগাড় একরূপ হইল, কিন্তু ভাল মাছ পাওয়া গেল না। কেননা সে দিন হাটবার নয়।

সদানন্দ বিন্দুবাসিনীকে "মা" বলিয়াছিল। বহুদিন পরে সেই মা'র জামাই আসিয়াছে, তিনি তাহাকে আশ মিটাইয়া খাওয়াইতে পারিবেন না, হয়তো ইহাতে মুখ্যি-কুলীন জামাই রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, এই সব ভাবিয়া সদানন্দ নিজের পুকুরে জাল ফেলিয়া আর একটু বেশী পরিশ্রম করিয়া, একটী কাতলা মাছ ধরিল। সুতরাং মাছের অভাবও রহিল না।

সদানন্দের বাড়ীতে ভাল গাওয়া ঘি ছিল, খেতে নূতন বেগুণ ফলিয়াছিল। প্রায় এক সের টাক খাঁটি দুধও দোওয়া ছিল। যাহা কিছু ঘর হইতে সংগ্রহ হইল, তাহাই সে তাহার মাতৃপ্রতিম বিন্দুবাসিনীকে দিয়া আসিল। আর কোন সময়ে গুপ্তভাবে যে এগুলি সে দিয়া আসিল, তাহা কেহ টের পাইল না।

এই সব আয়োজনের ফলে, জামাতা গোবিন্দের দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটা, একটু জাঁকালো গোছের হইল। গোপাল বেলা দুইটার পর আহারাদি শেষ করিয়া একটু গড়াইয়া লইলেন। কেননা—এটা তাঁহার নিত্য অভ্যস্ত করণীয় কার্য্য।

অপরাহ্নে গোপাল তাঁহার শাশুড়ীকে বলিলেন—"অনেক দিন আসি নাই এখানে। এই সুযোগে গাঁয়ের দুই এক জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসি!"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী ইহাতে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না।

কারণ কিসে জামাতার বৈকালিক আহারটা আরও একটু ভাল রকমের ব্যবস্থা করিয়া করা যাইতে পারে, শাশুড়ী বিন্দুবাসিনী, তখন সেই কথাটাই বেশী ভাবিতেছিলেন।

জামাতা বেড়াইতে গেলে—মা ও মেয়ে, প্রথমে বৈকালিক রন্ধন ও জলখাবারের ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইলেন। দুধকে ক্ষীরে পরিণত করিয়া, ক্ষীরের ছাঁচের জোগাড় হইল। নারিকেলের অভাব ছিল না—সুতরাং চন্দ্রপুলিও দল হইতে বাদ পড়িল না। জলযোগের সুব্যবস্থা করিয়া গৃহিণী কুটনা কুটিবার জন্য বঁটি লইয়া বসিলেন। কমলা তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল।

এই সময়ে মাও মেয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা আমাদের একটু আড়ি পাতিয়া শুনিতে হইবে।

বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"কমলা! আমাদের ভাগ্যটা একবার দেখ মা! ঠাকুরপো যখন নোটগুলো দিয়ে গেলেন, হাতে আমাদের পয়সা ছিল, জামাই বাবাজী তখন এলেন না। ভাগ্যে আমার কাছে দুটী টাকা ছিল! এছাড়া পৈতে বেচার একটী টাকা এখনো আমার কাছে আছে। কিন্তু আগেকার দুটাকা ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে খরচ হয়ে গেল। একটী টাকায় মর্য্যাদার কি উপায় হবে মা!"

কমলা বলিল—"সত্যই মা আমাদের বরাত। অন্ততঃ দশটা টাকা না হলে এ ক্ষেত্রে আমাদের মান থাকবে না।"

বিন্দু। তা হলে এখন করা যায় কি?

কমলা। তাইতো ভাবছি মা। সদা-দাদার বাড়ী একবার যাওনা, না হয়।

বিন্দু। না। তাদের কাছে হীন হয়ে টাকা চাইতে পারবো না। কারণ কখনও টাকা কড়ি তাহাদের কাছে চাইনি। ধর টাকা না হয় পেলুম। কিন্তু তা শোধ করবার সময় বড় গোল বাধবে। জানতো তোমার সদা দাদার মন! সেকি এ সামান্য দু'এক টাকা ফিরিয়ে নেবে?

কমলা বলিল—"শ্বশুর বাড়ী থেকে অপির আজ আসবার কথা আছে। হয়তঃ সে এতক্ষণে এসেছে। তাকে কেন একবার খবর দাও না মা।"

অপির কথা মনে পড়ায়, বিন্দুবাসিনী মহাবিপদসাগরে যেন একটা কুলকিনারা দেখিতে পাইলেন। অপর্ণা যদি আসিয়া থাকে, তা হ'লেত কোন ভাবনারই কারণ নাই। তার কাছে কোন লজ্জা-সংকোচের ভাবও তাঁহাদের নাই। বিন্দুবাসিনী যদি এ সম্বন্ধে লজ্জাবশে কিছু না বলিতে পারেন, তাহাহইলে কমলা অপির কাছে তাহার প্রয়োজন জানাইতে কোন সংকোচই করিবে না। স্বামী যদি মর্য্যাদার টাকা না পাইয়া রাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহাহইলে বড়ই লজ্জার কথা! বড়ই ঘৃণা-কলঙ্কের কথা! দশটা টাকা তাহাদের ঘরে নাই, একথা শুনিলে পাড়ার লোক মনেই বা ভাবিবে কি? বিশেষতঃ জামাই অনেক দিন পরে আসিয়াছে।

সাত পাঁচ ভাবিয়া, বিন্দুবাসিনী সদানন্দের কুমারী কন্যা, তমালীকে, অপর্ণা আসিয়াছে কিনা, তাহার সংবাদ লইতে পাঠাইল। এই তমালীর বয়স নয় বৎসর। সদানন্দ প্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে

ঠাকুরের নিত্যসেবার জন্য, আধ সের করিয়া দুধ জোগান দেয়। আর এই তমালীই নিত্য সেবার এই দুধটা দিয়া আসে।

বিন্দুবাসিনী তমালীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—"তোর রোজের দুধ দেবার সময় হয়েছে ত দিদি! একবার বড়বাড়ীতে যা দেখি। যদি দেখিস্—যে রাঙ্গাদিদিমণি তার শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এসেছে—তাহলে তাকে কেবলমাত্র বলিস্, একবার যেন সময় করে এ বাড়ীতে আসে। আর বলিস—কমলার বর এসেছে। এজন্য তার একবাব আসা দরকার।"

তমালী, বিন্দুবাসিনীর আদেশপ্রাপ্তি মাত্রেই তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য, তখনই খিড়কীর বাগান পার হইয়া জমীদার বাড়ীতে চলিয়া গেল। মেয়েটা খুব সেয়ানা। বলা বাহুল্য, সে রোজের দুধ না লইয়াই চলিয়া গিয়াছিল।

বিন্দুবাসিনী মধ্যাহ্নে রাঁধিয়াছিলেন বটে, এজন্য দিবাভাগে তাঁহার একটুও বিশ্রাম ঘটে নাই। জামাতার তৃপ্তির জন্য বৈকালে নানাবিধ ভোজ্যপাকের আয়োজনে, তাহার একটা নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে। এজন্য তিনিই রন্ধনশালায় গেলেন।

কিন্তু কমলা মাতাকে বাধা দিয়া বলিল—"মা! রাত্রে একে তুমি ভাল দেখ্‌তে পাও না। আঁস-হেঁসেল নিয়ে তোমার নাড়াচাড়া করে কাজ নাই। আমায় না হয় বলে দাও, শিখিয়ে দাও, আমিই সব খাবার কচ্ছি।"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"না—না, অপর্ণা এখনি আসবে। সে

খুব ভাল চুল বাঁধতে জানে। রান্নায় যদি তুই থাকিস, তা হলে চুল বাঁধবি কেমন করে ?"

কমলা সহাস্যমুখে বলিল—"কি বলছো তুমি মা! যে রান্না বান্না করে, সে কি চুল বাঁধবার অবকাশ পায় না ?"

যাই হোক, এ ক্ষেত্রে কমলার জেদই বজায় রহিল। বিন্দুবাসিনী, জামাতার জন্য, যে যে তরকারী রাঁধিতে হইবে, তাহার উপযুক্ত কুটনা ইতি পূর্ব্বেই কুটিয়া দিয়াছিলেন। কমলাকে রন্ধনসম্বন্ধে যথা প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া, তিনি জলখাবার সাজাইতে গেলেন।

প্রায় দুই বৎসর পরে জামাতা বাবাজী তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন। তাঁহার স্বামী বহুবার চেষ্টা করিয়া, তাহাকে মাত্র একবার আনাইয়াছিলেন—তার পর প্রসন্নকুমারও দুই তিনবার আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। কুলীনের ছেলে, তাতে ফুলের মুখুটী। উপযুক্ত মর্য্যাদা না পাইলে সে নিশ্চয়ই বাঁকিয়া বসিবে। এ জন্য গৃহিণীও দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া এসম্বন্ধে বিশেষ জেদ করিয়া একটা চেষ্টা করেন নাই। এতকাল ধরিয়া এক মনে নারায়ণকে ডাকিবার ফলে, কমলা অদৃষ্টে যে সুখের হাওয়া টুকু দেখা দিয়াছে, গৃহিণী বুঝিলেন, তাহা বুঝি সামান্য টাকার অভাবে বা নষ্ট হইয়া যায়।

আর ঠিক এই সময়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া কমলা ভাবিতেছে—"যদি অপি দিদি শ্বশুরবাড়ী হইতে না আসিয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে ? অপির কাছে টাকা চাহিতেই আমার যখন লজ্জা বোধ হইতেছে, তা অন্যের কাছে চাওয়া ত দূরের কথা।

তাহাহইলে এতদিন ভগবানকে মনে মনে ডাকিয়া, যাঁহার দর্শন পাইয়াছি, আমার নিস্ফলআশা অসম্ভবভাবে সফল হইয়াছে, তাঁহাকে সামান্য টাকার জন্য ধরিয়া রাখিতে পারিব না? তাহার পদ সেবা করিতে পারিব না?”

“কেন—তিনি কি আমার স্বামী নন? শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মিয়াছেন। একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তিনি। তাঁর প্রাণ কি একেবারে পাষাণ! একাবারে করুণা বর্জ্জিত! ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, নারায়ণ সাক্ষী করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, তিনি আমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন! এ পত্নীত্বের দাবি আমি সহজে ছাড়িব কেন?”

“তাঁহার চরণে লুটাইব। পায়ে ধরিয়া কাঁদিব। তবুও কি তাঁর দয়া হইবে না? তিনি আমার মুখের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিবেন না? পাঁচজনে আমার সুন্দরী বলিয়া প্রশংসা করে। এ সৌন্দর্য্যের কি কোন শক্তি নাই? কোন মূল্যই নাই?”

“কিন্তু অর্থ যে বড় ভয়ানক জিনিস! অভাবের কষ্টিপাথরে কসিলে, এই রজতচক্র যে সোনার চেয়ে এক এক সময় বেশী দামী হইয়া পড়ে। যদি আমার এ পত্নীত্বের দর্প না টেকে! যদি আমি হারিয়া যাই? তাহা হইলে কি হইবে?”

ভাল কথা মনে পড়িয়াছে। অশ্রুর চেয়ে, রমণীর প্রধান অস্ত্র আর কিছুই নাই। আমি কাঁদিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিব—“আর আমায় কষ্ট দিও না। আর আমাকে কাঁদাইও না। আর আমাকে রমণী জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ হইতে বঞ্চিতা করিও না। তুমি

স্বামী, নারায়ণ, আমার নিত্যপূজার দেবতা। আমার আরাধ্য, কামনীয়, পূজনীয়। তুমি ছাড়িলেও আমি তোমাকে ছাড়িব না! চোখে জল দেখিলে, অতি পাষাণ যে, সেও লোকের মুখের দিকে ফিরিয়া চায়। আর তুমি স্বামী হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিবে না। তার চেয়েও পাষাণ কি তুমি? তোমার ও কামকমনীয় মূর্ত্তির ভিতরে, এতই কি কাঠিন্য আছে? আমি অলঙ্কার চাহি না, বস্ত্র চাহি না, চাই তোমাব পদসেবা করিতে। আমি সুখ চাহি না, ঐশ্বর্য্য চাহি না, চাই তোমার চোখের সুমুখে থাকিয়া তোমার কষ্টের সংসারে তুঃখভোগ কবিতে। এ তুঃখভোগও করিলেও যে আমার মহা সুখ। তুঃখীর মেয়ে, আমি, তুঃখীর পত্নী আমি। বিধাতা যে তুঃখকে আমার চিরসহচর করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে ভয় করিলে চলিবে কেন?”

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে, কমলার ইন্দীবব নেত্র তুটী অশ্রুপ্লাবিত হইল। ভাগ্যে তাহার মা তখন কক্ষান্তরে কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, তাই রক্ষা। কমলা তখনই অঞ্চল প্রান্তদিয়া তাহার নেত্রবিগলিত উষ্ণাশ্রুবারিচিহ্ন লোপ করিয়া দিল।

(১৫)

ঠিক এই সময়ে স্থিরা বিদ্যুতপ্রতিমার মত কে একজন রান্না-ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। এ বাড়ীতে আঁস ও নিরামিষের তুইটী হেন্‌সেল ছিল। রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ায় আঁস রান্না হইত। কাজেই কমলা দাওয়ায় বসিয়া রাঁধিতেছিল।

আর যে ধীরে ধীরে কমলার পাশে আসিয়া বসিল, সে—অপর্ণা। অপর্ণা সেই দিন মধ্যাহ্নকালে তাহার শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার এ প্রত্যাগমন ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপেই কাক-তালীয়বৎ। কিম্বা বিধাতার যোগাযোগ।

বিন্দুবাসিনী, তাঁহার নিজের শুইবার অর্থাৎ বড় ঘরে, ক্ষীরের-ছাঁচ-চিনিরপুলি থালে সাজাইতে ছিলেন। দাওয়া হইতে সে ঘরটী একটু দূরে। সুতরাং রান্নাঘরের দাওয়ায় কি হইতেছে, তাহা এ ঘর হইতে দেখা যায় না।

অপর্ণাকে দেখিয়া, কমলা আহ্লাদে আটখানা হইল। তাহার মনের মধ্যে একটু আগে যে একটা অন্ধকারময় প্রবল ঝড় দেখা গিয়াছিল তাহা উড়িয়া গেল। সে হাসি মুখে বলিল—"কখন ফিরে এলি অপি দিদি!"

অপর্ণা অনুচ্চস্বরে বলিল—"তা আমার আসা যাওয়ায় কিছু আসে যায় না। বোনাই নাকি এসেছে?"

কমলা একটু হাসিল। এ হাসি আনন্দও বিষাদের মিশ্রণ। কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া হাঁ—না কিছুই বলিল না।

অপর্ণা বলিল—"মর্ পোড়ার মুখী! আমার কথার একটা জবাব দে না। হাঁ—কি—না বল্‌না।"

কমলা এই নাছোড়বান্দা অপর্ণাকে চিনিত। একটা কবুল জবাব না পাইলে, সে তাহাকে কোনমতেই সহজে ছাড়িবে না। কাজেই অস্ফুটস্বরে বলিল—"হাঁ—"

অপর্ণা বলিল—"তা হ'লে তুই আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিলি যে! কাঁদছিলি কেন?"

এই সুবুদ্ধিনাত অপর্ণার উৎক্রোশদৃষ্টির নিকট কমলা এবার ধরা পড়িয়া গেল। আর সে এই "কেনর" কোন উত্তর দিতে পারিল না।

কেন যে কমলা কাঁদিতেছিল—অপর্ণা তাহা না বুঝিয়া যে এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহা নয়। সে মনে মনে ভাবিল—একথার উত্তরটি কমলার নিকট হইতে পীড়াপীড়ি করিয়া বাহির করিতে গেলে, সে মনে বড়ই কষ্ট পাইবে। কাজেই কথাটা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া অপর্ণা বলিল—"বোনাই কবে এসেছে?"

কমলা। আজ দুপুর বেলা।

অপর্ণা। তুই তার সঙ্গে দুটো কথা কয়েছিস্ ত।

কমলা। তার সময় পেলুম কোথা!

অপর্ণা। তাও ত বটে! তা—রান্নার যে খুব চটক লাগিয়েছিস্—দেখ্ছি।

কমলা। কি করবো দিদি? মায়ের হুকুম!

অপর্ণা। যদি আমার হুকুম শুনিস, তা হলে অনেক মেহনত কম হয়ে যায়।

কমলা। কি?

অপর্ণা। গোহাল থেকে গরুটাকে বার করে, বোনাইকে একটা খড়ের জাব দিগে যা। আমার বিবেচনায়, সে একটা আস্ত গরু। যে তোকে চিন্‌লে না—দেখলে না, তোর মত

রূপসীর আদর কর্ত্তে জান্‌লে না—সে একটা মানুষ-গরু বই আর কিছুই নয় !"

কমলা। তা তোর বোনাই তুই সে কথা বুঝগে যা। তুই ভাই এ কাজটা ভাল পারিবি। আর, এ গোহালের ব্যবস্থাটা তুইই না হয় করে দিস্ বোন্! কিন্তু তোর বোনাইকে এ কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে তোর সাহস হবে ত ?

অপর্ণা। তা বল্‌তে পারিনি এখন! সাহসে কুলোয় ত করব। তা তুই এখন একবার রান্না ছেড়ে ছাদে চল। তোর চুল গুলো বেঁধে দি। যা চট্ করে গা ধুয়ে আয়। কি রাঁধতে হবে বল—আমি না হয় চড়িয়ে দিচ্ছি।

কমলা বলিল—"না তোকে আর শকড়ী হাত কর্ত্তে হবে না। অপি দিদি! যা হয়েছে, তাতেই আজ চলে যাবে। তুই একবার মার সঙ্গে দেখা করে আয়। আমি সব চাপাচুপি দিয়ে যাচ্ছি।"

কমলা গা ধুইতে ঘাটে চলিয়া গেল। অপর্ণা তাহার জ্যাঠাই মার ঘরে গিয়া বসিল।

অপর্ণার হাতে রুমালে বাঁধা একটী ছোট পুঁটলী ছিল। সেটী সন্তর্পণে লুকাইয়া, সে তাহার জ্যাঠাইমার কাছে গিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল—"কেমন আছ তুমি জ্যাঠাই মা ?"

বিন্দুবাসিনী কমলার চিবুকস্পর্শ করিয়া স্নেহভরে একটী চুম খাইলেন। তারপর তাহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন—"আমার থাকাথাকি কি মা ? তা তুমি কখন এলে ? তোমার ব্রতটী বেশ ভালয় ভালয় হয়ে গেছে ত ?"

অপর্ণা। তা তোমার আশীর্ব্বাদে আর নারায়ণের ইচ্ছায় কাজটা খুব ভাল রকমেই হয়ে গেছে। একশোর উপর বামুন খেয়েছে।

বিন্দুবাসিনী। খুব ভালই হয়েছে। নারায়ণ তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করুন মা। আহা! তোমার মা—কি গুণের বউই ছিল। তেমনি তর মেয়ে তুমি হয়েছ। এখন এই সব ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়েই থাক মা। নারায়ণ তোমার মনে শান্তি দেবেন। তোমার মুখের দিকে চাইতে গেলে যে আমাদের বুক ফেটে যায় অপু! তোমার মা ভাগ্যবতী! তাই সে চলে গেছে। আমরাই কেবল সইতে রইলুম।

অপর্ণার মনের ভিতর একটা মেঘ দেখা দিল। কিন্তু সেটা সে সামলাইয়া লইল। আর ঠিক এমন সময়ে কমলা আসিয়া সেখানে দেখা দিল। বিন্দুবাসিনী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"তোর অপি দিদি এসেছে। অর্পণা আমাদের খুব ভাল চুল বাঁধিতে পারে। তোরা ছাদে গিয়ে চুলটা বেঁধে আয়। তোর হাতের কাজ হয়ে গেছে ত?"

কমলা ঘাড় নাড়িয়া মার কথার উত্তর দিল। তার পর সে তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া, তেলের বাটী, চিরুণী, চুলের ফিতা, আরসী প্রভৃতি লইয়া, অপর্ণাকে ইঙ্গিত করিবামাত্রই, অপর্ণা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছাদে গেল।

কেশবিন্যাশ বিদ্যায়, অপর্ণা সত্যই অপূর্ব্ব কৌশলকলাময়ী। সে কমলার শ্যামাঠাকরুণের মত কুঞ্চিত কালো কেশগুলি, তৈলসিক্ত

করিয়া আঁচড়াইয়া, বিচিত্র বেণী রচনা করিয়া দিয়া, তাহার সিঁথায় ও কপালে একটী সিন্দুরের টিপ্ পরাইয়া দিল। তার পর আরসীখানি তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"কতদিন যে চুল বাঁধিস্ নি তুই কম্লি? চুলে যেন জট্ পড়ে গেছে। তা দেখ দেখি—এখন হয়েছে কেমন! পোড়ারমুখী ছাই ঢাকা আগুণ তুই! এ আগুণের তেজ ফুটে উঠলে, বোনাএর চোখ্ ঝল্সে যাবে। তোর চুল বাঁধাতো হয়ে গেল। এখন তোকে কনে সাজাতে হবে। তোর বাসরসজ্জার জন্য একখানা ভাল কাপড় চাই, দুগাছা সোনার বালা চাই। এক ছড়া হার চাই! তা আমি তোর জন্যে এ সব এনেছি।"

এই কথা বলিয়া অপর্ণা, তাহার সেই রুমালে বাঁধা পুঁটলিটী খুলিয়া একখানি ভাল দেশী কাপড় বাহির করিল। কাপড়খানি বেনারসীও নয়, রেশমী শাড়ীও নয়। একখানি শান্তিপুরে কলকা দার শাড়ী। সাদা গুল-বসানো। খুব মিহি। আর খুব দামী জিনিস। গহনা সে যা আনিয়াছিল, তাহাও মোটামুটি ধরণের।

কমলা বলিল—"অপি দিদি! ও কাপড় আমি পরবো না!"

অপর্ণা। কেন?

কমলা। তোর বোনাই কি মনে করবে বল দেখি! গরীব দুঃখী আমরা, তাতে সে কুলীন জামাই। ভাল কাপড় গয়না দেখ্লে মনে ভাববে, আমাদের কতই না পয়সা আছে।

অপর্ণা। তা ভাবে ভাবুক। সে ভাবনাও আমি ভেবে এসেছি। তোর অত মাথা ব্যথা কেন লা ছুঁড়ী? আমি তোর জন্যে দুটো সোণার মোহর আঁচলে বেঁধে এনেছি।

এই দুটো মোহর দিয়ে, বোনাইকে আগে প্রণাম করিস্। তাহলে সে আর কিছুই বল্‌বে না। গোড়ার কাজটা আমি এগিয়ে দিলুম। বাকী যা কিছু—তুই করবি। অমন সুন্দর চাঁদপানা মুখ—অমন পটলচেরা চোখ দুটি, অমন সুন্দর চাউনী, অমন সরলতা মাখা মূর্ত্তি—অমন মনমজানো মধুর হাসি। এত অস্ত্র তোর হাতে থাক্‌তে, তুই যদি বোনাইকে হারিয়ে দিতে না পারিস, তা হ'লে তোর মরাই ভাল।

দয়াবতী, স্নেহশালিনী অপর্ণা, কমলাদের অবস্থা বুঝিয়া সত্যসত্যই দুইটী মোহর আঁচলে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। সে তাহার ভগ্নিপতির স্বভাব জানিত। কুলীন জামায়ের দাবী দাওয়া এ সব ক্ষেত্রে কেমন হয়, তাহাও যে সে না জানিত তা নয়। কাজেই অপর্ণাসুন্দরী কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ না হইয়া, আর কমলাদের ভিতরের অবস্থা বুঝিয়া, সম্যকরূপে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল।

অপর্ণার হৃদয়ের অপূর্ব্ব উদারতা, স্নেহ ও করুণা দেখিয়া, কমলার চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। সে ধারা সে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। কমলা জানিত—এ নির্ম্মম, করুণাহীন, স্নেহহীন জগতে, এই অপর্ণা বই তাহার আপনার বলিবার কেহই ছিল না। সংসার ত তাহার চক্ষে মরুভূমির মত। এই মরু-ভূমির মধ্যে যখন অভাব অনাটনের আগুনের হল্‌কা ফুটিয়া উঠিত, তখন সে বড়ই দিশাহারা হইয়া পড়িত। এই সময়ে অপর্ণা তাহার কাছে শীতল বায়ুপ্রবাহের মত আসিয়া, তাহার সকল জ্বালার শান্তি করিয়া দিত।

ন্! আজ আমি যাই। সাবধান! চঞ্চল হয়ে যেন কাজ মাটি করিস নি।

এই কথা বলিয়া অপর্ণা, কমলাকে সঙ্গে লইয়া ছাদ হইতে া আসিল। তার পর কমলা খিড়কীর বাগান পর্য্যন্ত গিয়া মাকে অগ্রসর করিয়া দিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোপালগোবিন্দ পাড়া বেড়াইয়া শ্বশুরবাড়ীতে লেন। তাঁহাব পুবা নাম গোপালগোবিন্দ। তবে সাধারণতঃ নি গোপাল ঠাকুর নামে সম্বোধিত হইতেন। এজন্য আমরা াহাকে এখন হইতে গোপাল বলিয়াই উল্লেখ করিব।

(১৬)

গোপালগোবিন্দ আহারের বন্দোবস্ত ও শাশুড়ীর যত্ন হ মমতা দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, াদের অবস্থা আমি যতটা খারাপ ভাবিয়াছিলাম, দেখিতেছি রূপ নয়। শিষ্য বাড়ী হইতে মোটে দশটি টাকা পাইয়াছি, কিন্তু আমাব দেনার জন্য এবার অন্ততঃ পঞ্চাশটী টাকা সংগ্রহ না করিলে চলিবে না। আরও চল্লিশটী টাকা এখন আমার প্রয়োজন। অন্ততঃ পঁয়ত্রিশটী মুদ্রাও সংগ্রহ কবা চাই। কেননা এবার ফিরিয়া গিয়া, মহাজন জমীদার দুজনকেই কিছু না কিছু দিলে, তাহারা নালিশ করিয়া দিবে।

রাত্রে আহারাদির পর নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া, গোপালগোবিন্দ পান করিতে করিতে যখন এইরূপ অর্থসমস্যার দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন,

তখন রাত্রি দশটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেন না গ্রীষ্মকালের রাত দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া যায়।

এই সময়ে সাধ্বী কমলা, তাহার স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই, সে তাহার মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিল।

প্রদীপের উজ্জ্বল আলোক সেই মুখের উপর পড়ায়, গোপাল-গোবিন্দ হুঁকাটী রাখিয়া দিয়া, প্রস্ফুটিতশতদলসম, কমলার মুখের দিকে, কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্‌ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কমলা স্বামীর পায়ের ধূলা লইয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহাস্য মুখে বলিল—"কি দেখিতেছ একদৃষ্টে তুমি?"

গোপাল। তোমার অই সুন্দর রূপ!

কমলা, এ কথায় মনে মনে খুব প্রফুল্লিত হইল বটে, কিন্তু মুখে একটা কৃত্রিম নিরাশার ভাব আনিয়া বলিল—"আমাকে তুমি কি খুব রূপসী বলিয়া মনে কর?"

গোপাল। তা করি বই কি? এ জীবনে, আমি তোমার মত একটীও নিখুঁত সুন্দরী আর কখনও দেখি নাই।

কমলা। তা হ'লে আমায় এতদিন ভুলে ছিলে কেন?

গোপাল। তার কারণ আর কিছুই নয়। তুমি কুলীন পত্নী। যে কুলীনের একাধিক পত্নী থাকে, সে সকলকে খোঁজ করিতে পারে না। সকলকে এক সঙ্গে পুষিতে পারে না।

কমলা। দুই বৎসর পরে তুমি আসিয়াছ। কত দিনের সঞ্চিত, স্বামী-সন্দর্শনের সাধ আজ আমার পুরিয়াছে। ৮/৷

শুভ মুহূর্ত্তে—আমি পরম সৌভাগ্যবতী। এই দুই বৎসর আমি দিন গুনিয়া, চোখের জল ফেলিয়া কাল কাটাইতেছি। আগে স্বামী চিনিতাম না, সুতরাং ভাবিতেও শিখি নাই। এখন স্বামী চিনিয়াছি। যখন তোমায় একবার পাইয়াছি, তখন সহজে আমি তোমায় ছাড়িব না।

গোপাল, কমলার কথা শুনিয়া একটু হাসিল। ধীরভাবে রূপসী পত্নীর হাত খানি ধরিয়া বলিল—"এইখানে বসো।"

কমলা ছাড়িবার পাত্রী নয়। এই হাসি সে লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু সেই অপরিস্ফুট হাস্য যে কিসের জন্য, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। মনে ভাবিল, হয়তো এটা বিদ্রুপের হাসি! এজন্য বলিল—"আমার কথা শুনিয়া তুমি হাসিলে কেন?"

গোপাল। কেন—তাহা তোমার কাছে গোপন করিব না। শোন কমলা, আমার আরও দুই ভার্য্যা আছে। তাহাদের রূপ নাই, দর্প আছে—স্বামীসেবার ইচ্ছা নাই, কোলাহলপ্রবৃত্তি আছে। তাহারা স্বামী লইয়া কাড়াকাড়ি করে, কিন্তু কি করিয়া স্বামীকে ভালবাসিতে হয়, কি করিয়া তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা তাহারা জানে না। তোমাদের বাড়ীতে আসিবার পর, তোমাকে দেখিবার পর হইতে, আমার মনে একটা সংস্কার জন্মিয়াছে, যে ভগবান তোমাকে রূপে-গুণে সমান ভাবে গরীয়সী করিয়াছেন। তোমাকে লইয়া ঘর করিলে, আমি হয়ত সুখী হইতে পারিব। কিন্তু তুমি আমার বাড়ীতে গিয়া তাহাদের সঙ্গে একত্রে ঘরকন্না করিতে পারিবে কি? তোমার উপর একটু

সহানুভূতি দেখাইলেই তাহারা আমাকে ও তোমাকে, সেই বাড়ীতে তিষ্ঠিতে দিবে না। মনে ভাবিও না কমলা—তোমার কথা শুনিয়া আমি উপেক্ষাচ্ছলে হাসিয়াছি। তোমার ও আমার অবাধ মিলনের পথে যে একটা মহাবিঘ্ন আছে, তাহা তুমি না জানিয়া স্বামীসাহচর্য্যের স্থায়ী সুখের কল্পনা করিতেছ—তাহাতেই আমার হাসি আসিয়াছিল।

অপর্ণার মুখে কমলা তাহার সপত্নীদ্বয়ের গুণের কথা শুনিয়াছিল। এখন স্বামীর মুখে তাহার পুনরুক্তি শুনিয়া, পূর্ব্বশ্রুত কথাগুলি তাহার মনে খুব সত্য বলিয়া বোধ হইল।

কমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার তাম্বুলরাগ রঞ্জিত ওষ্ঠাধরপ্রান্তে একটা ভাষাহীন মিঠা হাসির লহর তুলিয়া, একটী কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"তাহা হইলে একটা কাজ কর না কেন?"

গোপাল। কি কাজ?

কমলা। কাজটা হচ্ছে—এই, দাসীবাঁদিবর মত তোমার সংসারে আমি খাটিতে প্রস্তুত। তোসামোদে, মিষ্টকথায়, আমার সপত্নীদের আমি নিশ্চয়ই বাধ্য করিতে পারিব। তুমি আমায় গৃহে লইয়া চল।

গোপাল, কমলার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"না—কমলা! তুমি তাহাদের কোনরূপেই, আপনার করিতে পারিবে না। সংসারের অভিজ্ঞতা তোমার নাই। তাই তুমি এ কথা বলিতেছ। আমি স্বামী হইয়া তাহাদের মত কলহপরায়ণা পত্নীদের, দাবে রাখিতে

পারি না, আর তুমি সপত্নীরূপে তাহাদের মিষ্টকথায়, সংব্যবহারে তুষ্ট করিবে কিরূপে, তাহাতো বুঝিতে পারিতেছি না। তারপর এখানে বহুদিন থাকিলে, আমার পৈতৃক জমীজমা যাহা কিছু আছে, তদারকের অভাবে তাহাব সবই নষ্ট হইয়া যাইবে।"

"জান না তুমি কমলা! আমার সংসার কত কষ্টে চলিতেছে। তিনটী ভার্য্যা পোষণেব আর্থিক শক্তি আমার আছে কিনা, তাহাও ঠিক আমি জানি না। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইও না—কমলা! আমি চারিদিক হইতে দেনায় জড়িত। মহাজনে পাওনা টাকার জন্য, আমার নামে নালিশ করিতে উদ্যত। সেই জন্যই এই দীর্ঘকাল পরে, আমি তোমাদের বাড়ীতে একটা আশা করিয়া আসিয়াছি। আর কাহাকেও আমি আমার মনের কথা এত সরলভাবে খুলিয়া বলিতাম না—তোমায় বলিলাম।"

কমলা—তখন বুঝিল, কুলীন-স্বামী কতটা স্বার্থপর হইতে হইতে পারে? শ্বশুরালয় হইতে রুধিরসংগ্রহ করাই, তাহার প্রধান ব্যবসা, জীবিকার্জ্জনের সহজ উপায়। গরীবের নিকট হইতে কিছু আদায় করাই, তাহার কৌলীন্যের মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

কমলা, কুলীনস্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক গল্পই ইতিপূর্ব্বে তাহার পাড়া প্রতি-বাসীদের ও তার মার নিকট শুনিয়াছিল। সে ভাবিত এ গল্পগু'লা যেন একটা রূপকথা। এখন তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া সে বুঝিল, রূপকথা যদিও কখন সত্য হয় না বটে, কিন্তু তাহর অদৃষ্টগুণে তাহা এখন প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

(১৭)

জগতে চিরদিন কাহারও সমান যায় না। নদীতে যেমন জোয়ারি ভাঁটা আছে, সেইরূপ, সাংসারিক জীবনেও সুখ দুঃখ আছে। যাহারা মনে ভাবে, অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতেই আমরা এ ধরার আসিয়াছি, দুঃখের মলিন ছায়ায় আমাদের এসুখ কখনও ম্লান হইবে না, তাহারা অতি আত্মবিড়ম্বিত। কেননা—দুঃখের দিন বর্ষার মেঘের মত যখন সহসা দেখা দিয়া, তাহাদের সুখের উজ্জল দিনটিকে একেবারে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তখন তাহারা একেবারে দিশাহারা ও বুকভাঙ্গা হইয়া পড়ে।

প্রসন্নকুমার ধনী। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি খুবই কম ছিল। নিজের ভাগ্য, তিনি নিজেই গড়িয়া লইয়াছিলেন! যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। সংসারে তাঁহার যথেষ্ট স্বচ্ছলতা ছিল। দেশের দশজনের কাছে তিনি সম্মানিত। দাতা, পরোপকারী ও ক্রিয়াবান বলিয়া, তাঁহার একটী সুনাম ও সম্মান ছিল। তবু প্রসন্ন-কুমার দিনে দিনে অসুখী হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

তাঁহার রূপসী পত্নী বিরজার রূপের শক্তি, তখন আর তাঁহাকে ততটা অধীর করিতে পারে না। বাসি ফুলের পাপড়িগুলি যেমন ক্রমে ক্রমে ঝরিয়া পড়ে, সেইরূপ সেরূপ প্রসন্নকুমার যাহার রূপ-জ্যোতিতে একদিন রতিদেবীর সৌন্দর্য্য দেখিতেন, তাহা যেন দিনে দিনে রূপরসগন্ধ বিহীন হইয়া পড়িতেছে। এ বিরক্তির কারণ আর কিছুই নয়, কেবল বিরজার জন্য তাঁহার শান্তিময়সংসারে অশান্তি।

আর তাঁহার সৌন্দর্য্য উপভোগের মোহাবসান! তিনি মনে মনে জমাখরচ মিলাইয়া দেখিলেন, এই রূপের সেবা করিতে গিয়া, তাঁহাকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইতেছে।

এ অশান্তি নানা কারণে ঘটিত। সে কারণগুলি কেবল প্রসন্নকুমারের স্বকৃত কর্ম্মফলের পরিণাম ফল। যতদিন হইতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাদের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, ততদিন হইতে তাঁহার দুঃখের দিন আরম্ভ হইয়াছে। বিরজার সঙ্গে এখন তাঁহার সাহচর্য্য অবস্থা দিনে দিনে বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিতেছে।

তিনি পত্নীকে কোন একটা অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার বা অনুযোগ করিতে গেলে, শাশুড়ী ঠাকুরাণী তখনই তাহার মাঝে আসিয়া পড়েন। প্রথম প্রথম জামাতার কাছে, তাঁহার যেমন একটা লজ্জা ও সঙ্কোচময় ভাব ছিল, তাহা এখন আর নাই। কন্যাকে তিরস্কার করিতে দেখিলে, তিনি জামাতাকে ক্রন্দনের সুরে বলিতেন—"ওকে আর কেন বাবা লাঞ্ছনা কর? ও আর ক'দিন বাঁচ্‌বে। নানা ভাবনায় ওর শরীর আধখানা হয়ে গেছে। দিনে দিনে অমন সোনার রূপে যেন কালি পড়ছে। তোমার কি বল না? গেলে আমারই মেয়ে যাবে। আর আমার নাতিনাত্‌নী গুলো ভেসে ভেসে বেড়াবে। তোমাদের আবার বিয়ে করবার পথে ত কোন আটক নেই।"

এ সব সাংঘাতিক ও কঠোর মন্তব্য শুনিয়া, প্রসন্নকুমার হাঁ—না কোন কথাই বলিতেন না। বলাও ঠিক নয়। তবে তিনি মর্ম্মের মধ্যে, বৃশ্চিকদংশনের একটা তীব্র যাতনা অনুভব করিতেন এবং এই

টুকু বুঝিতেন, অতি কুক্ষণেই তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

বিরজাও আজকাল নানাকারণে প্রসন্নকুমারের উপর বড়ই বিরক্ত। তাহার কেমন একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে, যে স্বামী দিন দিন তাঁহার উপর স্নেহশূন্য হইতেছেন। সপত্নীকন্যা অপর্ণাব উপরই তাঁহার বেশী টান। তাহাব গর্ভের ছেলে মেয়েদের প্রসন্নকুমার চু'চক্ষে দেখিতে পাবেন না। এজন্য কেবল স্বামীর উপর নয়, অপর্ণার উপরও তাহার ভয়ানক একটা ক্রোধ জন্মিল। এ ক্রোধের বিরক্তির ভাবটা, মনেব ভিতর চাপিয়া রাখিয়া সে তুষের আগুনে ধিকি ধিকি পুড়িতে লাগিল। হিংসার আগুণের জ্বালা বোধ হয়, তুষানলেব চেয়েও বেশী। কেননা যে হিংসা কবে, সে নিজেই কেবল এই আগুণের হলকায় পুড়িয়া মবে। আর যাহাদের হিংসা করে, ভগবান তাহাদের রক্ষা করেন।

তারপর প্রসন্নকুমারের অশান্তির তৃতীয় কারণ, তাহার শ্যালক কুল চূড়ামণি, এই গুণধর প্রসাদ বাবু।

প্রসাদ মফঃস্বলে যাইবার পর, প্রসন্নকুমার তাঁহার প্রধান গোমস্তাকে গোপনে একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্রে এই কথা গুলি লেখা ছিল,—"আমার শ্যালক রামপ্রসাদ বাবুকে, নানা সাংসারিক কারণে বাধ্য হইয়া, আমি নায়েবপদে নিযুক্ত করিলাম। তুমি আমার পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারি। আমার সম্বন্ধী হইলে কি হয়, তাহার চালচলন বিগড়িয়া গিয়াছে। বাবুয়ানায় তাহার সখ বড়ই বেশী। জমীদারীর কাজকর্ম্ম সে কিছুই বুঝেনা। এজন্য আমি উহার

কৃতকার্য্যতায় খুবই অবিশ্বাস করি। তুমি উহার কার্য্যকলাপের দিকে একটু নজর রাখিবে। আমি শীঘ্রই মহলে যাইতেছি। সম্‌মাহী কিস্তির টাকা, ঠিক সময়েই আমার চাই। এ কথাটা যেন তোমার মনে থাকে।"

সুবুদ্ধিমান গোমস্তা নিবারণ ঘোষ, বহুদিন জমীদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেছে। সে মনিবের এই চিঠিখানি পাইয়া, মনে একটু সাহস পাইল। সে অবশ্য এই চিঠিখানি, তাহার নূতন মনিব, নায়েব রামপ্রসাদ বাবুকে দেখাইল না কিন্তু তাহাকে তাহার মর্ম্মাংশ অর্থাৎ যেটুকু তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল, তাহা শুনাইতে ছাড়িল না। এজন্য সে সুবিধা বুঝিয়া, সেইদিন রাত্রে রামপ্রসাদকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল—"কর্ত্তা মহাশয় স্বয়ং শীঘ্রই জমীদারী পর্য্যবেক্ষণে আসিতেছেন। আর সম্‌মাহীর কিস্তির টাকা, জোরতলবে আদায় করিতে হুকুম দিয়াছেন। আপনি আমাদের উপরিতম কর্ম্মচারী। এ ব্যবস্থা আপনাকেই করিতে হইবে।"

রামপ্রসাদ ভগ্নিপতির পয়সায় বাবুয়ানা করিতেই শিখিয়াছে, কিন্তু প্রজার নিকট হইতে কি উপায়ে খাজনা আদায় করিতে হয় আদায় তহশীলের সেরেস্তা রাখিতে হয়, তাহা ত সে জানে না। সেরেস্তার জমাখরচের হিসাবপত্র এই নিবারণ গোমস্তাই করিত। আর প্রসাদবাবু—কেবল মাছের মুড়া, গাওয়া ঘি, ঘনদুধের সর খাইয়া দেহ পুষ্ট করিত। তারপর নাক ডাকাইয়া সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, মহাতৃপ্তিতে নিদ্রা দিত।

রামপ্রসাদ নিবারণের কথা শুনিয়া একটু দমিয়া গেল। তাহার

ঘটে একটুকুও বুদ্ধি যে ছিল না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সে তাহার সহযোগী কর্ম্মচারীদের মধ্যে এই নিবারণকেই একটু বিশ্বাস করিত। ভগ্নিপতি আসিতেছেন শুনিয়া, তাহার মনে বড় ভয় হইল। এজন্য সে নিবারণকে পরদিন নির্জ্জনে পাইয়া বলিল—"এই সম্মাহী কিস্তির টাকা, কত নিবারণ বাবু?"

নিবারণ বলিল—"আজ্ঞে—মামাবাবু! টাকাটা বড় কম নয়, আড়াইটী হাজার টাকা চাই।"

"ইহার মধ্যে কত টাকা তোমরা আমার আসিবার আগে সদরে চালান দিয়াছ?

"দুই কিস্তিতে মোটে এক হাজার।"

"তাহা হইলে এখনও দেড় হাজার টাকা চাই।"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তহবিলে কত জমিয়াছে?"

"মোটে তিনশত"

"পনেরোশো টাকা দরকার, জমেছে মোটে তিনশো!"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"উনিত এই মাসের মধ্যে আসিবেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তাহা হইলে উপায়?"

বুদ্ধিমান নিবারণ এইবার প্রসাদ চরিত্রের দৌর্ব্বল্য কোন খানে, তাহা বুঝিল। সে চিন্তিতমুখে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"উপায় আর কিছুই নেই! যে উপায়ে হোক, তিনি আসি-

লেই টাকা তাহাকে দিতে হইবে। তাহা না হইলে একটা মহা হুলস্থূল বাধিয়া যাইবে।

"জমীদারী সেরেস্তায় টাকা জমা করিতে পারি, টাকা গুণিয়া বাক্সের মধ্যে ফেলিতে জানি, কিন্তু টাকা আদায়ের উপায় ত আমি জানি না। তুমি আমার সহায়তা কর নিবারণ বাবু। আমি দিদিকে বলিয়া তোমার মাহিনা বাড়াইয়া দিব। তোমার ভাল করিয়া দিব। তোমায় আমি "মিতে" সম্বোধন করিতেছি। বোনাই বাবুর কাছে যাহাতে অপ্রস্তুত না হই, দিদিমণির কাছে যাতে বকুনী না খাই, তার ব্যবস্থা কর।"

এ সংসারে দুই পয়সা উপরি—উপায়ের প্রত্যাশী অনেকেই। নিবারণও এই শ্রেণীর লোক। এতদিন সে আদায় তহশীলের কাজে বেশ দু'পয়সা পাইতেছিল। আর জমীদারী সেরেস্তার কাজ যাহারা করে, তাহাদের সকলেই এইরূপ বাজে আদায় দ্বারা কিছু গুজরান্ করিয়া থাকে। কেননা তাহাদের তলবানা অতি কম।

যিনি ইতিপূর্ব্বে সদর-নায়েব ছিলেন, প্রায় ছয়মাস হইল তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। নূতন নায়েব বাহাল না হওয়া অবধি, এই নিবারণ ঘোষ এতদিন নায়েবের কাজই করিতেছিল। কিন্তু তাহার পর রামপ্রসাদরূপ রাহুগ্রহ আসিয়া পড়ায়, তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বাজে আদায়ের পথে একটা বাধা পড়িয়াছিল।

সুচতুর নিবারণ ঘোষ দেখিল—এই রামপ্রসাদকে হস্তগত করিতে না পারিলে, তাহাকে চাকরী ছাড়িতে হইবে। উপরি

পাওনার পথ যদি লোপ হয়, তাহা হইলে পাঁচটাকা মাহিনায় তাহার এই গোমস্তাগিরি চাকরী করা চলিবে না। জমীদার প্রসন্নবাবুর সম্বন্ধী হইতেছেন এই নূতন নায়েব মহাশয়। তাঁহাকে চটান ভাল নয়। কুমীরের সহিত বিবাদ করিয়া, জলে কখনও বাস করা যাইতে পারে না।

এজন্য নিবারণ স্থির করিল সে—এই রামপ্রসাদকে হাতে না রাখিতে পারিলে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। জমীদারীর কাজে, এই রামপ্রসাদ যে একটী আকাটমূর্খ, তাহাও সে দুই এক দিনের মধ্যেই বুঝিয়া লইল। বার টাকা হইতে একটাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা জমা খরচ করিতে হইলে, সে সাতখানা কাগজ আর এক দোয়াত কালি খরচ করে, তিনটা কলম ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহার হিসাব-জ্ঞানের প্রমাণ অনাবশ্যক। এজন্য সে মনে মনে সংকল্প করিল, যেন তেন প্রকারেণ এই রামপ্রসাদকে হাতের মুঠার ভিতর আনা চাই।

নিবারণ যখন মনোমধ্যে এই সব কথার আলোচনা করিতেছিল, সেই সময়ে রামপ্রসাদ নিবারণের ডান হাতখানি ধরিয়া একটু আগ্রহের সহিত বলিল—"এখানে আর যে দুজন কর্ম্মচারী আছে, তাদের আমি একটুও পছন্দ করি না। বিশ্বাসও করি না নিবারণ বাবু। আমি তোমায় আদায় তহশীলের ভার দিতেছি। যাহাতে বোনাইবাবু এখানে না আসেন, আর তাঁর সমুদাই কিস্তির টাকাটা শীঘ্র চালান হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা তোমাকে করিতে হইবে। মনে যেন থাকে—তুমি আমার "মিতে" হইয়াছ।

নিবারণ ঘোষ, সে দিন যে কার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। এত সহজে যে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। এজন্য সে বড়ই হৃষ্টচিত্ত হইল। সে মনে মনে ভাবিল, যদি এই বামুনের ঘরের অকাল কুষ্মাণ্ডটাকে হাতে রাখিতে পারি, তাহাহইলে আমার পাথরে পাঁচ কিল। আদায় তহশীল আমার হাতে থাকিলে, এই হিড়িকে সুযোগে বুঝিয়া, আমি বেশ দু'পয়সা সঞ্চয় করিতে পারিব। তবে সহী-সাবুদ দস্তখতের ব্যাপারে আমি নাই। আগে দাখিলাগুলায় এই জানোয়ারের সহি করাইয়া লইতে হইবে। বস্—তা হলে আমায় ধবে কে? জমীদারের ন্যায্য প্রাপ্য যাহা, তাহা বজায় রাখিয়া, তাহার উপর যাহাতে আমি শতকরা পাঁচটা টাকাও রাখিতে পারি, সে ব্যবস্থা আমাকে করিতে হইবে। তাহাহইলে এবার গাঁয়ের বাড়ীখানা দোতালা করিতে পারিব।

এই সব কথা ভাবিয়া নিবারণ এই মূর্খ চুড়ামণি রামপ্রসাদকে বলিল—"মামাবাবু! আমি সে ধরণের লোক নই। যথন আমার উপর আপনি ষোল আনা নির্ভর করিতেছেন, তখন আমি যথাসাধ্য আপনার সকল কাজেই সহায়তা করিব। আপনার ভগ্নিপতির অন্ন খাইয়া আমি মানুষ। যদি কিছু কম হয় ত বার বৎসর কাল এই সেরেস্তায়, এক কলমে কাটাইয়া দিলাম! তা আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না। আমার লাল সিং আর গোপাল সিং দরোয়ান দুটো বাঁচিয়া থাক। আমার বুদ্ধি লইয়া যদি আপনি আদায় তহশীল করেন, এই সম্‌মাইয়ের টাকা

তাহাহইলে এক মাসের মধ্যেই জোরতলবে আদায় করিব। খালি তাই নয়, আপনার মারফতেই যদি এই কিস্তিটা বাবুকে পাঠাইতে পারি, তাহ'লে বাবু এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই মহলে কখনও আসিবেন না। টাকা নিয়মিত যাইতেছে না বলিয়াই বাবু আসিতে চাহিতেছেন। আমি যদি বাবুর আসার পথ বন্ধ করিয়া দিই, তাহাহইলে ত আপনি সুখী হইবেন!"

নিবারণের কথা শুনিয়া, প্রসাদ বড়ই খুসী হইল। সে নিবারণের হাত দুখানি আগ্রহের সহিত টিপিয়া ধরিয়া বলিল— "নিবারণ বাবু! আমি তোমার মন জানি বলিয়াই, তোমাকে মনের কথা বলিয়াছি। তা তুমি আমার সহায়তা কর। বোনাই বাবুর কাছে আমার যাতে মান রক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। তোমার এ উপকার আমি ভুলিব না। দেখ! নায়েবী করা আমার দিদির ইচ্ছা হইলেও, আমার মনের ইচ্ছা তাহা নহে। আমি খাইয়া পরিয়া ফুর্ত্তি করিয়া দিনকতক মজা লুটিতে চাই। এ সব টাকাকড়ির হিসাব, আদায়পত্রের ঝুঁকি লওয়া, আমার ক্ষমতায় নাই। তা তোমার দাখিলা গুলো লইয়া এসো। আমি সব গুলাতেই সহী করিয়া দিতেছি। এ কাজে এত হাঙ্গামা জানিলে কোন ব্যাটা আসিত।"

চতুর নিবারণ তাহাই চায়। এই উত্তেজনার মুখে, এই কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তির সময়ে, যাহা কিছু হইয়া যাইবে তাহাই টিকিবে। আজ যে সুযোগটা চলিয়া যাইবে, তাহা কাল হয়ত আর আসিবে না।

ইহা ভাবিয়া, নিবারণ তখনই দপ্তরখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দাখিলা বহিগুলি লইয়া আসিল ! আর রামপ্রসাদ তাহার একান্ত নিঃস্বার্থ বন্ধু, পরোপকারী নিবারণকে বাধ্য করিবার জন্য, তাহার সকল গুলিতেই বিনা সঙ্কোচে সহী করিয়া দিল।

সেদিন রামপ্রসাদকে ধরাইয়া, এই সব কাজ করাইবার একটা সুযোগও এই নিবারণের পক্ষে ঘটিয়াছিল। সেই সেরেস্তায় আর একজন গোমস্তা ও একজন কারকুন কাজ করিত। এদের দুজনের বাড়ী সেই গ্রামে। তাহারা সেরেস্তার কাজকর্ম্ম সারিয়া প্রতিদিনই রাত্রে বাড়ীতে চলিয়া যায়। অন্যদিন তাহাদের কাজকর্ম্ম সারিতে, রাত্রি দশটা বাজিয়া যায়। সেদিন নিবারণের অদৃষ্টক্রমে, তাহারা রাত্রি নটার আগেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল।

দাখিলাগুলি সহি করাইবার পর. নিবারণ সহাস্যমুখে বলিল—"মামাবাবু! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কোন ভাবনা নাই আপনার! খান দান—ফুর্ত্তি করুন। সব ঝুঁকি আমি ঘাড়ে লইলাম। তবে খরচপত্রের ব্যাপারে প্রথম প্রথম বাড়াবাড়ি না করিয়া, একটু সামলাইয়া চলিবেন। কেননা, জমীদারী সেরেস্তার সকল লোকই ভাল নহে। অনেকে কর্ত্তাকে আপনার এই সব বাবুয়ানার সম্বন্ধে গোপনে চিঠি লিখিয়া জানাইতে পারে। আপনার নিত্যসেবার প্রয়োজনীয় সবই ত আমি ইতিপূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। এ ছাড়া যদি অন্য কোনও কিছু প্রয়োজন হয়, তাহাও আমি করিয়া দিতে পারি। এই কাছারি-বাড়ীতে যাহাতে আর কোন লোকজন

রাত্রে না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করুন। এখানে এরূপ স্বাধীন অবস্থায় থাকিলে আপনি অনেক মজা পাইবেন।"

মূর্খ রামপ্রসাদ, নিবারণের এই সলা পরামর্শে মনে ভাবিল, ভগবান তাহার মত নির্ব্বোধের এক বুদ্ধিমান সহায় যুটাইয়া দিয়াছেন। প্রসাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে নিবারণের কেনা গোলাম হইয়া পড়িল। সে নানাবিধ মিষ্ট কথায় নিবারণকে আপ্যায়িত করিয়া বলিল—"নিবারণ! বাবু আজ আমার পাতে তোমায় প্রসাদ পাইতে হইবে।"

নিবারণ তখনই দাঁড়াইয়া উঠিয়া যুক্তকরে বলিল—"সেত ভাগ্যের কথা! জানিনা আজ কাঁর মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম। মামা বাবু! আপনার নজর বড় উঁচু। অতি সাদাসিদে লোক আপনি! আর আমাদের সবারই ভাগ্য ভাল যে আপনার মত মনিব আমরা পাইয়াছি।"

জগতে খোসামোদে সবাই ভোলে। মূর্খ প্রসাদ ভুলিবে না কেন? সেতো এই জগত ছাড়া নয়।

প্রসাদ বলিল "দেখ নিবারণ! আমার স্বভাবই এই, ভাল জিনিস আমি একলা খেতে পারি নি। পাঁচজনকে দিয়ে কোন ভাল জিনিষটা খেলে মনে যে একটা আনন্দ হয়, তার চেয়ে বেশী সুখ আর নেই। আজ একটু মহাপ্রসাদ পেয়েছি। কাজেই তোমায় আজ প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করছি। না বল্লে ভারি মনকষ্ট পাবো।

নিবারণ জানিত, সেদিন একজন প্রজা কালীতলায় তাহার সন্তানের মঙ্গল কামনায় একটী পাঁঠা বলি দিয়াছিল। আর

আত্মীয়তা জানাইবার জন্য নূতন নায়েব বাবুকে সের টাক মাংস উপহার স্বরূপ দিয়া গিয়াছিল। গ্রামের এক দীন ব্রাহ্মণ সন্তান, শ্রীমান প্রসাদের রসুয়ে-ব্রাহ্মণের কাজ করিত। প্রসাদও সেদিন এই মহাপ্রসাদ খুব তরিবৎ করিয়া রাঁধাইতেছিল।

নিবারণ পূর্ব্ব হইতেই এ কথাটা জানিত। যখন এরূপ একটা অনুরোধ নূতন নায়েবের দিক হইতে আপনাআপনি আসিয়া পড়িতেছে, তখন সেই বা সুযোগ ছাড়ে কেন?

এই কয় দিনে সুচতুর নিবারণ রামপ্রসাদের চালচলন ও মতিগতির অনেকটা আভাস পাইয়াছিল। এই নিবারণ লোকটা বড় সহজ নয়। এই গ্রামে, সে অনেকদিন চাকরী উপলক্ষে বাস করিতেছে। প্রসন্নবাবুর জমীদারী সেরেস্তাতে দেখিতে দেখিতে, তাহার দশ বৎসর চাকরী হইয়া গেল। তাহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল না। পটলমণি বলিয়া এক কৈবর্ত্তের বিধবা, তাহার অনুগৃহিতা।

সেই গ্রামখানা প্রসন্নবাবুর জমীদারী। কাজেই সে গ্রামে নিবারণের খুব আধিপত্য। সকলেই তাহাকে বড় গোমস্তা বলিয়া চেনে। সে যদিও এক মাটীর-ঘরে বাস করিত, তাহাহইলে সে মাটীর ঘর, নিতান্ত হীনশ্রী নহে! বাড়ীখানির চারিদিকে মাটীর পাঁচিল। উঠানের উত্তরদিকে একখানা বড় ঘর। নিবারণ এই ঘরে শয়ন করেন। তাহা ছাড়া একখা'ন রান্নাঘর, একটী গোশালা আর একখানি ছোট শুইবার ঘরও ছিল। স্বয়ং শ্রীমতী পটলমণি এই ছোট ঘরেই থা কিত।

এসব ঘৃণিত কথার অবতারণা করিবার ইচ্ছা আমাদের না থাকিলেও, প্রসাদের চরিত্রটী পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া দেখাইবার জন্য, আমাদের এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইতেছে। আর ভবিষ্যতে এই পটলমণিকে লইয়া খোদ প্রসন্নকুমারকে মহা গোলযোগে পড়িতে হইয়াছিল। এজন্য এই পটলমণি ও তাহার আশ্রয়দাতা নিবারণের সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহা বলা খুবই প্রয়োজন।

নিবারণ এ কথাটা জানিত—যে এই প্রসাদবাবু লুকাইয়া চুরাইয়া একটু কারণ—করিয়া থাকেন। সে এরূপ ভাব দেখাইত, যেন সে কথাটা জানিয়াও জানে না। আজ উপযুক্ত অবসর পাইয়া বলিল—"মামাবাবু! একটা কথা বলবো কি ?"

প্রসাদ। কি কথা নিবারণ বাবু ?

নিবারণ। ভয়ে—না নির্ভয়ে বলবো !

প্রসাদ। নির্ভয়ে বল। যখন তোমার সঙ্গে নিতে পাতিয়েছি, তখন আমার কাছে তোমার কোন সংকোচই নাই।

তবুও নিবারণ মাথা চুলকাইতে লাগিল। কিন্তু এটা চক্ষুলজ্জার জন্য নয়। তাহার ষোল আনা বদমায়েসী।

নিবারণের এই ভাব দেখিয়া, প্রসাদের কৌতূহল অতি মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। সে নিবারণের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "নিবারণ বাবু! অত সংকোচ করছো কেন ? স্বচ্ছন্দে বলে ফেল তোমার মনের কথা।"

নিবারণ বলিল—"আমি জানি, অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের মধ্যে

অনেকেই একটু কারণ করে থাকেন। আমার বিশ্বাস, যখন এক ধনী জমীদারের সম্বন্ধি আপনি, তখন এ অভ্যাসটাও হয় তো আপনার আছে। আর তান্ত্রিক মতে পঞ্চমকারের "উপাসনা" বলে একটা ব্যাপার আছে। সুতরাং এই 'কারণ' করাটা শাস্ত্র-সঙ্গত ব্যবস্থা। বড় বড় সন্ন্যাসী ও কাপালিক এই ভাবে কারণ করে থাকেন! এটা শক্তি সাধনার একটা অঙ্গ বইতো নয়।"

নিবারণের বাঁকা কথাটা, এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সংযোগে, নূতন দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিবারণ যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য মনোমধ্যে পোষণ করিয়া একথা বলিতেছে—তাহা বুঝিতে না পারিয়াই, মুর্খ প্রসাদ সরল ভাবে বলিল—"তোমাকে যখন মিতে বলেছি, তখন তোমার কাছে আর লাজলজ্জা কি? আমি একটু আধটু কারণ করে থাকি বই কি?"

নিবারণ সহাস্য মুখে বলিল বলিল—"আজ রাত্রের মত কারণ বারি আপনার সংগ্রহে আছে ত? না আনাবার জোগাড় করবো?"

রামপ্রসাদ বলিল—"তা একটা বোতল যদি আনাতে পারো ত ভালই হয়—নিবারণ বাবু! তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আমি! আমি যেমন সরল ভাবে তোমার কাছে আমার মনের সকল কথাই খুলে বললুম, তুমি সেইরূপ বলবে না?"

নিবারণ। আজ্ঞে কেন বলবো না? আপনার সঙ্গে যখন মিতে পাতিয়েছি, আর আমার অন্নদাতা মনিবের বড় কুটুম্ব আপনি, আমাদের মামা বাবু আপনি, তখন আপনার কাছে যা বলবো, তা হলফান এজাহারের মতই সত্য।

প্রসাদ সহাস্য মুখে বলিল—"তা হলে তুমিও একটু আধটু কারণ করে থাক? জহুরী না হ'লে জহর চেনে না ত নিবারণ বাবু।"

নিবারণ। তা করি বই কি মামাবাবু। আমাদের পাঁচ পুরুষ হ'চ্ছে শক্তিমন্ত্রের উপাসক। মাকালপুরের ঘোষ আমরা। এখনও আমাদের দেশের বাড়ীতে শ্যামা-পূজা হয়।

প্রসাদ। তা ভালই হলো। আজ সকল বিষয়েই মনের মত একজন বন্ধু পেলুম। সহায় পেলুম। তা মহাপ্রসাদটা যখন তরিবৎ রূপে তৈরির ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তখন একটু কারণ আনাও। এই নাও টাকা।"

এই কথা বলিয়া, প্রসাদ তাহার জামার জেব হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া, নিবারণের হাতে দিল। নিবারণ তখনই তাহার একজন বিশ্বাসী পাইককে, কারণ সংগ্রহার্থে গ্রামে পাঠাইয়া দিল।

পাইক চলিয়া গেলে, নিবারণ সহাস্যমুখে বলিল—"মামাবাবু! মামার বাড়ীতেত লোক পাঠানো হলো। পঞ্চমকারের মদ্য মাংস ত জোগাড় হয়েছে। আজ ভরা অমাবস্যা। হুকুম হয় ত—যেটা সব চেয়ে প্রধান, সেটাও যোগাড় কর্ত্তে পারি। যখন আমায় মিতে বলে কোল দিয়েছেন, আর আমায় বিশ্বাস করে, আপনার মনের কথা খুলে বলেছেন, তখন আমি আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আপনার কেনা গোলাম আমি।

প্রসাদ নিবারণের এ চাটুময় কথায় হাতে স্বর্গ পাইল। সুরা

ও সুন্দরী দুই পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, আব আমোদটা পুরা দমে চলিবে বলিয়া সে নিবাবণের কথাটা খুব ভালরূপ বুঝিতে পারিলেও একটু ন্যাকাপামার সুরে, একগাল হাসিয়া বলিল—"তুমি মেয়ে মানুষের কথা বল্‌ছো নাকি নিবারণ বাবু ?"

নিবারণ। আজ্ঞে হুজুর! তা বই আর কি! আপনাব দাসানুদাস এ নিবারণের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই।

প্রসাদ প্রফুল্লচিত্তে বলিল—"তা হ'লে ত খুব ভালই হয়। পূজাটা ষোড়শোপচাবেই শেষ করা যায়। কিন্তু পাড়া-গাঁয়ে এই নিশুতি রাতে তুমি মেয়ে মানুষ পাবে কোথায়।"

ঠিক এই সময়ে, পূর্ব্বোক্ত পাইক, এক বোতল মদ্য লইয়া, সেই স্থানে দেখা দিল। নিবারণ, বোতলটী এক সিন্দূকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া বলিল—মাল ত ভাঁড়ার জাত হলো। এখন প্রধান যেটি তার বন্দোবস্ত কর্ত্তে পাল্লে, আমার একটা ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন মামাবাবু! সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

এই কথা বলিয়া, নিবারণ তাহার সেই বিশ্বস্ত পাইকের কাণে কাণে গোটা কয়েক কথা বলিয়া, তাহাকে সেই নিশীথকালে তাহার বাসা বাটীতে পাঠাইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পটলমণি বলিয়া এক বিধবা কৈবর্ত্তকন্যা নিবারণের আশ্রিতা ছিল। সে কুটনা কুটিত, বাটনা বাটিয়া দিত, ঘর ঝাঁইট দিত, গৃহস্থালীর সকল কাজ কর্ম্ম করিত। দুষ্ট লোকে বলিত—সে এসব কাজ ছাড়া অনেক সময়ে সে নাকি গোপনে নিবারণের অন্নপাক পর্য্যন্ত করিয়া দিত! নিবারণ কিন্তু তাহা

স্বীকার করিত না। আর তার ভয়ে, কেহ মুখের উপর এ কথাটা বলিতেও সাহস করিত না।

কথাটা যে একবারে অমূলক—তাহাও নয়। নিবারণ দিবা ভাগে লোকদেখান স্বপাক করিত। আর লোকে তাহা দেখিতে পাইত। রাত্রে—পটলমণি নিবারণের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিত। কারণ নিবারণ কাছারি হইতে বাসায় ফিরিত, রাত্রি দশটার পর।

পটলমণি যুবতী, উজ্জল—শ্যামাঙ্গী। মুখশ্রী মন্দ নয়, টানাটানা চোখ্ দুটী তার। সর্ব্বদেহের শ্রী—ছাঁদও মন্দ নয়। পটলমণির বাপ মা কেহই নাই। তবে তাহার পৈত্রিক একখানা ভাঙ্গা কুঁড়ে আছে বটে।

পিতৃমাতৃহীনা যুবতী পটলমণি, তাহার পিতার মৃত্যুর পর, দিনকতক তাহার সেই পৈত্রিক ভাঙ্গাকুঁড়ের মধ্যে অতি কষ্টে একা দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার এই নিঃসহায় অবস্থার সুযোগে, সেই মৃৎকুটীরের আশে পাশে, দুই চারিটা উপদেবতা গভীর রাত্রে ঘুরিতে ফিরিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ তাহাদের এই ঘোরাফেরা আপত্তির সীমায় দাঁড়াইল। পটলের পিতা, জমীদার প্রসন্নকুমারের একজন পাইক ছিল। এই গোমস্তা নিবারণের অধীনেই সে জমীদারীর কাজ করিত। তাহার নাম—দূর্ল্লভ পাইক।

মরিবার সময় দূর্ল্লভ পাইক, নিবারণের হাতদুটী ধরিয়া সকাতরে বলিয়া গিয়াছিল—"গোমস্তা মশাই! মেয়েটার তুকুলে কেউ রইল না। ও না হয় গতর খাটিয়ে খাবে। আপনি ওকে একটু দেখবেন।"

পটলের পিতার মৃত্যুর পর নিশীথবিহারী এই অপদেবতার উপদ্রব দিনে দিনে খুবই বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু নিবারণ একজন জবরদস্ত গোমস্তা ছিলেন। তিনি দুজন দুর্দ্দান্ত পাইক চৌকিতে বসাইয়া, এই উপদ্রবের শান্তি করিলেন। পটলকে বলিলেন—"তুই আমার বাসায় আসিয়া দিন কতক থাক্। তাহা না হইলে আমি তোকে এই সব বদমায়েসের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিব না। দেখ-পটলি! একটা পেট্ তোর। এই পাড়া গাঁয়ে তিনটা টাকা হইলে খুবই চলিয়া যায়। আমি তোকে তিন টাকা মাহিনা দিব। তুই আমার সংসারে কাজ কর্ম্ম কর। তারপর এ সব উপদ্রব থামিয়া গেলে, না হয় নিজের বাড়িতে যাস্।"

গোমস্তা মশায়ের এই প্রস্তাবে পটলমণি সম্মত হইল। কেননা এরূপ করা ভিন্ন তখন তাহার আত্মরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না। এই ভাবেই আট নয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই কৈবর্ত্ত দুহিতা পটলমণি এখন নিবারণ গোমস্তার কথায় মরে বাঁচে।

বলা বাহুল্য, পটলমণির পৈত্রিক জীর্ণ কুটীরখানি, এই কয় মাসে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। তাহা নূতন ভাবে তৈয়ারি করিতে গেলে, পঞ্চাশ যাট টাকার প্রয়োজন। তা অত টাকাই বা দেয় কে? কাজেই পটলমণি গত্যন্তর বিহীনা হইয়া গোমস্তার কাছেই রহিয়া গেল।

কারণবারি আসিবার পরই নিবারণ যে তাহার এক বিশ্বাসী পাইককে এই পটলের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল ইহা একটু আগে বলিয়াছি। সে একটু উদ্দেশ্য লইয়াই কাজ করিতেছিল। কি

উদ্দেশ্য পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে তাহার একটু আভাস পাইয়াছেন। আর না পাইয়া থাকেন, আমরা এই টুকু বলিতে পারি—যেন তেন উপায়ে এই নির্ব্বোধ নায়েব রামপ্রসাদকে প্রলোভনে ফেলিয়া বাধ্য করাই, তাহার মনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য।

রামপ্রসাদকে ভগবান যে কি অসার উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্লেষণ করিতে সুচতুর নিবারণ গোমস্তাকে বিশেষ কষ্ট করিতে হইল না। সে জানিত, এই নূতন নায়েব প্রসাদবাবু, লুকাইয়া চুরাইয়া, একটু কারণ বারি থাকেন। এ সম্বন্ধে একবার তাহার লাজ লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলে, ভবিষ্যতের ঘটনাগুলা অতি সোজা হইয়া যাইবে। আর ইহার মধ্যে কৌশলে কোন উপায়ে একটা মেয়ে মানুষকে আনিয়া ফেলিতে পারিলে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ সহজেই পরিস্ফুট হইবে।

নিবারণের মনিব জমীদার প্রসন্নবাবু পুরাতন নায়েবের মৃত্যুর পর, নিবারণকেই এই নায়েবীপদ দিবার কথা একবার আভাসে-ঈঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্য হইতে, এই প্রসাদ বাবু আসিয়া পড়ায়, তাহার সে স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িয়াছিল। প্রসাদকে অপ্রতিভ করিয়া বিদায় করিতে না পারিলে, তাহাকে একান্ত অপদার্থ রূপে দাঁড় করাইতে না পারিলে, তাহার ভবিষ্যৎ আশা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে, অনেক বাধা বিঘ্ন বর্ত্তমান! এই জন্যই সে প্রসাদকে আয়ত্ব করিবার জন্য প্রলোভন জাল বিস্তার করিল।

নিবারণ মনের মধ্যে সংকল্প স্থির করিল, টাকাকড়ি নিয়মিত রূপে আদায় করিয়া, যদি মনিবকে পাঠাই, সম্মাহী কিস্তির

টাকাটা যদি সহজে তুলিয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে আমার মনিবের, এখানে আসিবার সম্ভাবনা খুব কম হইয়া যাইবে। আর টাকা যদি তাঁর আসার আগে আদায় হইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি আসিলেই বা ক্ষতি কি? ইতিমধ্যে মামাবাবুজীকে বেশ করিয়া জালে জড়াইয়া ফেলিতে পারিলে কাজটা অতি সহজ হইয়া যাইবে।

যাহাহউক, নিবারণের মনের সংকল্প সে অক্ষরেঅক্ষরে, কার্য্যে পরিণত করিল। পূর্ব্বোক্ত চালা ঘরের দাওয়ায়, তাহাদের বসিবার স্থান ঠিক হইয়াছিল। আর শ্রীমতী পটলমণিও সেখানে উপস্থিত থাকিয়া নিবারণের শিক্ষামতে, তাহার নিজের ভুমিকাটা খুব দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিল। বলাবাহুল্য, রামপ্রসাদকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্য পান করাইয়া, সে তাহার পেটের অনেক কথা বাহির করিয়া লইল। আর তাহারই কৌশলে, পটলমণি একটু কৌশলময় কায়দার সহিত নিজের ইজ্জৎ বজায় রাখিয়া, বাক্যে কথায় এই গণ্ডমূর্খকে মোহিত করিয়া ফেলিল। রামপ্রসাদ বিদ্যায় মা স্বরস্বতীর বরপুত্র হইলেও, নেশা-ভাঙ্গটা করিলেও, সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কথনও স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে আসে নাই। সে দিন একটা রঙ্গিলা নেশার ঘোরে, এই ঢলঢলযৌবনসমন্বিতা, নষ্টচরিত্রা, কৈবর্ত্তকন্যাকে দেখিয়া, রামপ্রসাদের মাথাটা একটু বিগড়াইয়া গেল। সে ভাবিল, এ জগতে নিবারণের মত তাহার হিতকারী বন্ধু আর কেহ নাই। নিতান্ত ভাগ্যগুণেই তাহার এ বন্ধুলাভ ঘটিয়াছে। নিবারণ তাহার সহায় থাকিলে কিসের ভয়? লোকে বলেন,

খুব তরিবৎ করিয়া রাঁধা, মহাপ্রসাদের সামান্য অংশ যাইবে।

রামপ্রসাদের ভোগে আসিল। কেননা সে ভয়ানক মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল। বাকী অংশটা—একটা পাত্রে ঢালিয়া, পটলমণিকে দিয়া, নিবারণ তাহার বাসায় পাঠাইয়া দিল।

সংজ্ঞাহীন, জড়িতস্বর, প্রসাদকে অনেক কষ্টে তুলিয়া লইয়া গিয়া, নিবারণ পাশের ঘরের এক বিছানায় শোয়াইল। তার পর তাহার সেই বিশ্বাসী পাইককে বলিল—"হাঁড়িতে এখনও অনেক মাংস রহিল। বামুনঠাকুর তাঁহার ভাগ লইয়া, তোমাকেও এক ভাগ দিবে। খাইয়া দাইয়া আজ তুমি এই ঘরেই শুইয়া থাক। কারণ মড়া আগলাইবার লোক একটা ত চাই।" তারপর নিবারণ স্বগৃহে চলিয়া গেল।

(১৮)

এই হতভাগ্য রামপ্রসাদকে কাছারি-বাড়ীতে এই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া, একবার আমাদের কমলার সন্ধান লইতে হইবে। সেখানে কমলার অদৃষ্টে কি ঘটিল, তাহা একবার দেখা দরকার।

স্বামী গোপালগোবিন্দ, সেদিন রাত্রে কমলার অঙ্গস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলেন—"সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া, আমি তোমাকে শীঘ্রই আমার বাড়ীতে লইয়া যাইব। তাহা না হইলে, আমার জীবনটা বৃথাই যাইবে। আর পৌছিয়াই, তোমাকে একখানি চিঠি লিখিব।"

বলা বাহুল্য—প্রথম প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে, কোনরূপ বন্দোবস্ত বিলেও, গোপালগোবিন্দ কমলাকে তাঁহার পৌছান সংবাদটা রূপে জ নাই।

কমলা সে চিঠিখানি অপর্ণাকে দিয়া পড়াইয়া লইল। কমলা গরীবের মেয়ে। সেকালে মেয়েছেলেদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার এতটা প্রাদুর্ভাব হয় নাই। কিন্তু ধনী প্রসন্নকুমার, তাঁহারি আদরিণী কন্যা অপর্ণাকে, বাড়ীতে এক পণ্ডিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া ছিলেন।

পত্রখানায় বেশী কোন কিছু লেখা নাই। এ কালের যুবকেরা রূপশালিনী যুবতী পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া, নভেলি-ধরণে, বিরহের হা—হুতাশপূর্ণ কথায়, যেভাবে পত্রাদি লেখে, এ পত্রে তাহার কোন কিছুই ছিল না। কেবল ছিল—"কমলা! আমি নিরাপদে এ বাটীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমার জন্য তুমি ভাবিও না। শীঘ্রই তোমাকে এ বাটীতে লইয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিব। মাতাঠাকুরাণীকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইবে। আর তুমি আশীর্ব্বাদ জানিবে।"

চিঠিখানি নানাবিধ বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ। আমরা তাহা ঠিক করিয়া দিয়া, উপরে তাহার নকল করিয়া দিলাম।

একটী দিন মাত্র স্বামীসমাগমে, কমলা তাহার দুঃখময় জীবনে সুখের অধিকারিণী হইয়াছিল। কিন্তু হায়! ভাগ্যদোষে সে সুখ বুঝি তাহার সহিল না!

কেননা—তাহার জননী বিন্দুবাসিনী, শরীরের অসুস্থতার জন্য দুই তিনটা উপোস দিয়াও জ্বরে পড়িলেন। বহুঘন ব্যবস্থা করিয়াও কোনরূপ উপশম হইল না। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী মনে ভাবিয়াছিলেন, দু'একদিন উপবাস দিলেই, তাঁহার এ জ্বরভাবটা কাটিয়া যাইবে।

কারণ এদানীং তাঁহার এইভাবেই জ্বরজাড়ি হইত, আর মনের খুব একটা অস্বচ্ছন্দতার জন্য শরীরটি একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এবার তাঁহাকে শয্যা আশ্রয় করিতে হইল।

তিন দিন চারি দিন সামান্য গা গরম অবস্থাতেই কাটিল। পঞ্চম দিনে জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিল। বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। কমলা ভয় পাইয়া, তাহার সদানন্দ দাদার বাড়ীতে ছুটিয়া গেল।

সদানন্দ কৃষিকর্ম্মে খুব নিপুণ ছিল বটে, কিন্তু রোগের লক্ষণ চিনিতে ততটা মজবুত নয়। তবে এ জীবনে, সে অনেক রোগী দেখিয়াছে। জ্বর সোজা কি বাঁকা, তৎসম্বন্ধে তাহার একটা অভিজ্ঞতাও আছে। সে তাহার বামুন-মাতার অবস্থা দেখিয়া, একটু ভয় পাইল। কোন কিছু না বলিয়া, কেবল রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলা, তাহার সদাদাদাকে এইরূপ নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া, মলিনমুখে বলিল—"চুপ করে রইলে কেন সদা দাদা? আমার মার জ্বরটা কি খুব শক্ত?"

সদানন্দ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"তাই যেন বোধ হচ্ছে দিদিমণি। দেখছনা—মা খুবই নিঝুম হ'য়ে রয়েছেন! একবার তুমি না হয়, ও বাড়ীর রাঙ্গাবাবুর কাছে যাও। তাঁকে ডেকে আন। আমি আর বৌ—এখানে রইলুম।"

কমলা সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া, তখনি খিড়কীর বাগানের পথ ধরিয়া বড়-বাড়ীতে গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বাগানের পরই

প্রসন্নকুমারের বাস্তুভিটা। এই বাগানখানিই, তিনি বিন্দুবাসিনীর নিকট হইতে জমা লইয়াছিলেন। এই বাগানের মধ্য দিয়াই, অপর্ণা কমলাদের বাড়ী যাওয়া আসা করিত।

বাটীতে ঢুকিয়া, কমলা শশব্যস্তে দ্বিতলে উঠিল। অপর্ণার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"অপি দিদি! রাঙ্গাকাকা কোথায় ?"

অপর্ণা তখন ঠাকুর প্রণাম শেষ করিয়া, আসন, পুষ্পপাত্র ও পূজার উপকরণ গুলি গুছাইয়া রাখিতেছিল। কমলাকে হাঁফাইতে হাঁফাইতে, তাহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অপর্ণা বলিল—"তোর মুখ অত শুকিয়ে গেছে কেন ? হাঁফাচ্ছিস কেন রে ?"

কমলা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"দিদি! মার বড় ব্যায়রাম।"

"তিন চারদিন আগে ত আমি, তোদের বাড়ী গিছলুম কমলি! সেদিন ত জ্যাটাইমার কোন অসুখ ছিলো না। তা বাবাকে ডেকে দিচ্ছি। তুই এখানে বোস্। তিনি বোধ হয়, ঠাকুর-ঘরে আছেন।

অপর্ণা ত্রিতলে চলিয়া গেল। ত্রিতলেই ঠাকুর ঘর।

প্রসন্নকুমার পূজা-আহ্নিক শেষ করিয়া, ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অপর্ণা গিয়া তাহাকে বলিল, "বাবা! তোমায় একবার জ্যাটাইমার বাড়ীতে এখনি যেতে হবে। তাঁর খুব জ্বর হয়েছে। কম্লি তাই ভয় পেয়ে, তোমাকে ডাকতে এসেছে।"

প্রসন্নকুমার তখনই দ্বিতলে আসিয়া, অপর্ণার কক্ষে প্রবেশ

করিয়া দেখিলেন—কমলা কাঁদিতেছে। প্রসন্নকুমারকে দেখিয়াই সে চোখের জল মুছিবার চেষ্টা করিল।

প্রসন্নকুমার স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "পাগলি কোথাকার? কাঁদছিস্ কেন? জ্বর কি কারো হয় না? ভয় কিসের?"

প্রসন্নকুমার তখনই উত্তরীয়স্কন্ধে অগ্রসর হইলেন। কমলা তাঁহার পশ্চাদবর্ত্তিনী হইল। অপর্ণা বলিল—"বাবা! একটু জল খেয়ে গেলে ভাল হ'তো না?"

প্রসন্নকুমার বলিলেন—"এসে জল খাব অখন। আগে তোর জ্যাঠাইমাকে একবার দেখে আসি।"

প্রসন্নকুমার চলিয়া গেলে, বিরজাসুন্দরী সেই ক্ষেত্রে দেখা দিল। সে অপর্ণাকে বলিল—"অপু! কমলা কাঁদছিল কেন রা? হয়েছে কি?"

অপর্ণা বলিল—"ওর মার খুব জোরে জ্বরটা এসেছে, তাই ভয় পেয়ে কাঁদছিল। ছেলে মানুষ বইতো নয়—নতুন মা!"

বিরজা কথাটা শুনিয়া বিরক্তভাবে বলিল—"এ আবার এক নতুন ধরণের ন্যাকামি। জ্বর কি কারো হয় না? না জ্বর হলেই মানুষ মরে যায়। তা সাত তাড়াতাড়ি উনি এখন না গিয়ে, একটু পরে গেলেই ত যেতে পার্ত্তেন। কাল রাত্রে ওঁর শরীরটা ভাল ছিল না বলে, জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নি।"

বিমাতার স্বভাবসিদ্ধ এই প্রকার পরুষবাক্যে, অপর্ণা চির-অভ্যস্তা। সে ইহার উত্তরে কোন কিছুই বলিল না। কারণ বোবার শত্রু নাই।

প্রসন্নকুমার কমলাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, রোগীর শয্যা পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া, রোগিণীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তৎপরে বলিলেন—"কমলা! তুই ভয় পাচ্ছিস্ কেন মা! এতো সোজা জ্বর। তবে বয়স হয়েছে, আর জ্বরটা খুব জোরে এসেছে বলে সেই জন্য একটু নিঝুম হয়ে পড়েছেন।

প্রসন্নকুমার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—"বৌ ঠাকরুণ!"

বিন্দুবাসিনী চক্ষু চাহিলেন; ইঙ্গিতে প্রসন্নকুমারকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিতে বলিলেন। তারপর আবার চোখ্ বুজিলেন।

প্রসন্নকুমার একজন বিত্তসম্পন্ন লোক। সেকালে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে, গোমস্তা কারকুন প্রভৃতি কর্ম্মচারীর মত, এক-জন অন্নভোজী কবিরাজও থাকিত। এজন্য প্রসন্নকুমারের বাড়ীতে অন্যান্য আশ্রিত কর্ম্মচারিদের সঙ্গে, একজন কবিরাজ ছিল। এই কবিরাজটী বেশ সুচিকিৎসক। তাঁহার নাম রাধামোহন সেন গুপ্ত।

প্রসন্নকুমার বলিলেন—"আমি এখনই গিয়া কবিরাজ মহা-শয়কে পাঠাইয়া দিতেছি। তিনি ঔষধ দিয়া যাইবেন। ভয় পাইবার কোন কারণ নাই! তোর খাওয়া দাওয়া হয়েছে কি কমলা? না হয়ে থাকে আমার সঙ্গে আয়।"

কমলা বলিল—"আমার খাওয়া হয়ে গেছে রাঙা কাকাবাবু! মার অসুখ দেখে, আমি সকাল সকাল খেয়ে নিয়েছি।"

প্রসন্নকুমার তখনই ফিরিয়া গিয়া, কবিরাজ মহাশয়কে সব কথা বলিয়া কমলাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। কবিরাজ মহাশয়, ঔষধাদি ব্যবস্থা করিলেন। কমলা ঔষধ খাওয়াইবার ভার লইল।

মধ্যাহ্নকালে, আহারান্তে বিশ্রাম করা প্রসন্নকুমারের চির অভ্যস্ত কাজ। কিন্তু সেদিন তিনি তাহা না করিয়া, কমলাদের বাড়ী যাইবার সংকল্প করিলেন। কেন না—কবিরাজ আসিয়া, এই জ্বরের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একটু আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কবিরাজের ব্যবস্থামত ঔষধাদি সেবন করানো ঠিক হইতেছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য, তিনি সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে বাগানখানি অতিক্রম করিয়া, কমলার মাতার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রোগীর অবস্থা পূর্ব্বেরই মত। তবে কবিরাজ মহাশয় যে প্রলেপটির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেওয়ায়, মাথার যন্ত্রণাটা অনেকটা কম। রোগিণী স্থির হইয়া, চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন।

সেই দিন কাটিল। রাত্রি আসিল। কবিরাজ মহাশয় সন্ধ্যার পর পুনরায় দেখিতে আসিলেন। সঙ্গে প্রসন্নকুমার।

বহুক্ষণ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষার পর, কবিরাজ মহাশয় একটু মুখ বাঁকাইলেন। আর কেহ তাহা না দেখিলেও, প্রসন্নকুমার তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু চিন্তিত হইলেন।

কবিরাজ মহাশয়, পুনরায় ঔষধ বদ্‌লাইয়া দিয়া গেলেন। প্রসন্ন-কুমার স্বহস্তে ঔষধ মাড়িয়া রোগীকে সেই ঔষধ খাওয়াইলেন।

তারপর তিনি কমলাকে বলিলেন—"ভয় নাই তোর মা! আমি আর একবার এসে দেখে যাবো।"

প্রসন্নকুমার বাটির বাহিরে আসিয়া, কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি বুঝিতেছ?"

কবিরাজ বলিলেন—ভাল নয়। সম্ভবতঃ মধ্যরাত্রে জ্বরত্যাগ হইবে। সেই সময়ে একটা টাল আসিবে। সে টালটা যদি কাটিয়া যায়, তাহা হইলে রোগী প্রভাতকাল পর্য্যন্ত টিকিবে। এ সময় টুকু যদি মধ্যে পাই, তাহাহইলে প্রভাতে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিব।" এই কথা বলিয়া কবিরাজ চলিয়া গেলেন।

কবিরাজের কথা শুনিয়া, প্রসন্নকুমার বড়ই শঙ্কিত হইলেন। রোগিণীর জীবনাশা ত্যাগ করিলেন। একটু পরেই দ্রুতপদে বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া, তিনি কবিরাজকে বলিলেন—"সেনগুপ্ত! যদি এই রোগীকে বাঁচাইতে পার, পঞ্চাশ মুদ্রা তোমার পুরস্কার। রাত্রি আটটার পরই আমি অপিকে লইয়া উহাদের বাড়ী যাইতেছি। তুমিও আহারাদি শেষ করিয়া প্রস্তুত হও। তোমাকেও আজ রাত্রে ও বাড়ীতে থাকিতে হইবে। কে জানে—কখন কি প্রয়োজন হয়?"

কবিরাজ বিমর্ষমুখে বলিলেন—"কর্ত্তাবাবু! আপনার অন্নে আমার শরীর। কোনরূপ অতিরিক্ত পুরস্কার প্রত্যাশা আমি করি না। আমার এক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি প্রাণপণে করিয়া যাইব। তবে কি জানেন বাবু! একে বুড়া হাড়, তাহাতে জ্বরটা খুব দোষযুক্ত। জ্বরই বা কেন বলি—বিকারের পূর্ণ লক্ষণ

দেখা দিয়েছে। রাত্রের টাল্‌টা না সামলালে, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি-নি। তা আপনি আপনার সুবিধা মতই যাবেন্। আমি খেয়ে দেয়ে, একটু আগেই না হয় যাইতেছি।"

প্রসন্নকুমার চিন্তিতমুখে, তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মলিনমুখ দেখিয়াই, অপর্ণা সোৎসুকে বলিল "বাবা! জ্যাঠাইমার খবর কি? কোন ভয় নেই ত?"

প্রসন্নকুমার বলিলেন—"তোর কাছে কিছু গোপন করবো না অপি! কেন না, তুই বড় সাহসী, বড় সহিষ্ণু। তাঁর অবস্থাটা আমি ভাল বুঝছি নি।"

অপর্ণা। কি সর্ব্বনাশ। জ্যাঠাইমা চলে গেলে কমলার কি দুর্দ্দশা হবে বাবা?

প্রসন্ন। সদ্যোপ্রসূত মাতৃহীন শিশুকে কে দেখে অপর্ণা? তুমি আমি ভেবে কি করবো? দেখবার কর্ত্তা ত সেই ভগবান!

অপর্ণা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কমলি যে তা হলে ভেসে যাবে। জ্যাঠাইমার বড় আদরের মেয়ে সে!"

প্রসন্নকুমার বলিলেন—"তোর চেয়ে ত তোর গর্ভধারিণীর আদরের মেয়ে কেউ ছিল না মা! সে কবে স্বর্গে চ'লে গেছে। তাতে তোর কি বেশী কষ্ট হয়েছে অপু? তুই কি মানুষ হস্‌নি?

অপর্ণা। আমার যে তোমার মত স্নেহময় পিতা আছেন। আহা! কমলা যে পিতৃহীনা। আর স্বামী থেকেও নেই।

প্রসন্ন। তা হলেও তার 'রাঙ্গাকাকা' আমিতো এখনও

বর্ত্তমান! ও সব কথা ভাববার সময় এখন নয়। আমি চারিটী আহার করে নিই। ভাল কথা অপি! তুই আজ আমার সঙ্গে না হয় ও বাড়ীতে চল।"

কমলা। তুমি না বল্লেও ত আমি যেতুম বাবা! মরণ আমি ঢের দেখেছি। দেখে দেখে এ বুক পাষাণ হয়ে গেছে। আর যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তা হ'লে আমি ভিন্ন কমলাকে কেউ সাম্‌লাতে পার্ব্বে না!

প্রসন্নকুমার আহার করিবার সময়, তাহার পত্নী বিরজাকে বিন্দুবাসিনীর সংকট পীড়া ও তাঁহার সম্ভাবিত মৃত্যু সম্বন্ধে, সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন।

বিরজা বলিল—"তা হ'লে আজ আর তুমি বাড়ীতে আস্‌ছো না।"

প্রসন্ন। বোধ হয় না।

বিরজা। দেখ ছেলেপুলের ঘরকন্না হ'চ্ছে তোমার। যেন মড়া-টড়া ছুঁয়োনা। তোমার বল্লে ত তুমি আমার কোন কথা শোন না। এ রাত্রে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবারই বা দরকার কি? যা হবার তাই হবে। তোমরা গিয়ে কি, তা হাত দিয়ে আট‧কাতে পার্ব্বে!

অন্য কেউ এ ভাবের কথা বলিলে—সে প্রসন্নকুমারের নিকট তাহার বেয়াক্কেলের জন্য যথেষ্ট তিরস্কৃত হইত। কিন্তু প্রসন্নকুমার বিরজার মুখে এ ধরণের প্রাণহীন কথা শুনিয়া, মনেমনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। কোন কথাই তিনি বলিলেন না। যথা সময়ে

কন্যাকে লইয়া তিনি কমলাদের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কবিরাজ মহাশয়, তার পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রসন্নকুমার—কবিরাজকে জনান্তিকে ডাকিয়া বলিলেন—"কি বুঝিতেছ সেনগুপ্ত!" তিনি কবিরাজ-মহাশয়কে সেনগুপ্ত বলিয়াই সম্বোধন করিতেন।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"কর্ত্তাবাবু! গতিক বড় ভাল নয়! বোধ হয় দুপুরের টাল কাটিবে না?"

প্রসন্নকুমার অতি চিন্তিতভাবে বলিলেন—"কেন?"

কবিরাজ। আমার পুঁজিপাটা যাহা কিছু ছিল, তাহার বিবেচনাপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া, আমি রোগীকে ঔষধ দিয়াছি। যখন ইহাতেও বিকারের নাড়ীর অবস্থা ফিরিল না, তখন আর আশা কই?

যাহা হউক, অতি সতর্কতার সহিত—রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিল। অপর্ণা ও কমলা দুইজনে বিন্দুবাসিনীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। রোগিণী কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে, ঠোঁট নড়িতেছে, কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

সহসা রোগিণীর যেন একটু চেতনা হইল। বিন্দুবাসিনা অতি ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন—"কমলা!"

কমলা তখনই তাহার মায়ের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"কেন মা?"

বিন্দু। একটু জল দে মা!

কমলা, একটী পিতলের ঝিনুকে করিয়া, বিন্দুবাসিনীর মুখে জল দিতে যাইতেছে, এমন সময়ে বিন্দুবাসিনী আবার প্রশ্ন করিলেন—"ও কি জল মা!"

কমলা। গঙ্গাজল দিচ্ছি যে মা!

বিন্দুবাসিনী, তখন বিনা আপত্তিতে জল পান করিয়া বলিলেন, "কমলা! এখন রাত কত?"

কমলা। বোধ হয় এগারটা।

বিন্দু। তাই ত—তাহ'লে কি হবে?

কমলা। কিসের কি হবে মা?

বিন্দু। তোর রাঙ্গা কাকাকে একবার ডাকবার কি হ'বে!

কমলা বলিল—"তোমার অসুখ বেড়েছে দেখে, রাঙ্গাকাকা আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। পাশের ঘরে তিনি বসে আছেন। তাঁকে ডেকে আন্‌বো কি!"

বিন্দু। নারায়ণ সত্য! যাও তাঁকে ডেকে আন।

সহসা বিন্দুবাসিনীর দৃষ্টি, শয্যার বামপার্শ্বের দিকে পড়িল। তিনি কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন দৃষ্টিশক্তির সহায়তায় দেখিলেন, আর একটি স্ত্রীমূর্ত্তি, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে।

বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"কে তুমি? তেলী বউ?"

পার্শ্বে অপর্ণা চুপটী করিয়া বসিয়াছিল। সে বলিল—"না জ্যাঠাই মা! আমি তোমার অপ্পি!"

বিন্দুবাসিনীর চোখে জল আসিল। সে অশ্রুধারা, আন্তরিক কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি। এই নিরাশ্রয় অবস্থা তাঁহার। এ জগতে

কেউ তাঁহার আপনার বলিবার নাই। কিন্তু সকল কাজ ফেলিয়া এই অপর্ণা আর রাঙ্গাঠাকুরপো তাঁর রোগের সেবায় নিযুক্ত। এই সর্ব ভাবনায়, বিন্দুবাসিনীর বিশীর্ণ গণ্ডদেশ বহিয়া, সেই কৃতজ্ঞতার অশ্রু বালিসের উপর পড়িল।

অপর্ণা তখনই অঞ্চল প্রান্ত দিয়া, তাহার জ্যাঠাইমার চোখের জল মুছাইয়া বলিল—"কাঁদছো কেন জ্যাঠাইমা? কমলি যে ভয় পাবে।"

বিন্দুবাসিনী ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"রাজার মেয়ে তুমি। রাজার বৌ তুমি। তোমায় কি আশীর্ব্বাদ করবো মা? ধর্ম্মে তোমার মতি থাক্। তোমার এ হতভাগিনী জ্যাঠাইকে তুমি মার চেয়েও ভাল বাস্ যে। যে দিন জামাই এসেছিলেন, সে দিন তুমি এই চাটুজ্জে-পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষা করেছো। তুমি আর কমলা এক কোলে মানুষ হয়েছো। কমলা কখনও আমার মাই খেয়েছে, কখনও তোমার মার মাই চুষে মানুষ হয়েছে। মা অপর্ণা—যদি আমি মরি, আমার কমলাকে তুমি দেখো।"

বিন্দুবাসিনীর চক্ষে আবার অশ্রুধারা বহিল। অপর্ণা অঞ্চল-প্রান্ত দিয়া, আবার সে অশ্রুধারা মুছাইয়া দিল। সে বলিল—"কেন জ্যাঠাইমা! ওসব কথা বলছো তুমি! মা কবে স্বর্গে চলে গেছেন। মার স্নেহ তোমার কাছেই পেয়েছি। নারী হয়ে জন্মেছি। কি শক্তি আমার আছে জ্যাঠাইমা, যে কমলিকে দেখ্‌বো? যিনি দেখবার তিনি দেখ্‌বেন।"

বিন্দু। না—না ও কথা বলিস্‌নি। তুই যে মা—আমার নারী-

রূপে দেবী! নারীর শক্তি কত বেশী, তার দয়া কত বেশী, তার স্নেহ কত দামী, সবই তোর নিজের কাজে প্রকাশ পাচ্ছে।

বিন্দুবাসিনী আর বলিতে পারিলেন না। তিনি দুই তিনবার তাঁর বিশুষ্ক জিহ্বাটী বাহির করায়, অপর্ণা বুঝিল—তিনি জল চাহিতেছেন।

সে আবার সেই পিতলের ঝিনুকে করিয়া, তাঁহার মুখে গঙ্গাজল দিল। তৃষ্ণার জল পাইয়া, বিন্দুবাসিনী একটু শান্তভাব ধারণ করিলেন।

এমন সময়ে কমলা ও প্রসন্নকুমার তাঁর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাড়াইলেন। প্রসন্নকুমার বলিলেন—"আমায় ডাক্‌ছিলে বৌদি!"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"হাঁ রাঙ্গা ঠাকুরপো। এই বোধ হয় তোমার স্নেহময়ী বৌদির শেষ ডাক। কমলা কোথায়?"

কমলা বলিল—"এই যে মা আমি!"

বিন্দুবাসিনী, কমলার হাতখানি ধরিয়া, প্রসন্নকুমারের হাতে রাখিয়া বলিলেন—"রাঙ্গা ঠাকুরপো! তোমার ঋণ, এ জন্মে শোধ কর্ত্তে পাল্লুম না। স্বামী স্বর্গে যাবার পর, আমাদের দুঃখের দিন গুলি যে বিনাকষ্টে কেটে গেছে—তা তোমারই দয়ার জন্য। আমার অভাগিনী কমলার কেউ নেই এ জগতে। উপরে সেই নারায়ণ! আর নীচে তুমি! আমি যে আর বেশীক্ষণ নই—তা বুঝছি। আমার শেষ অনুরোধ—কমলাকে দেখো। জামাইকে এনে এই বাড়ী ঘর তাকে দিয়ে কমলার উপায় করো।"

বিন্দুবাসিনী চক্ষু মুদিলেন, কথা বন্ধ করিলেন। এই তাঁর

শেষ কথা। শেষ অনুরোধ। অনেক কষ্টে তিনি এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া চোখ্ বুজিলেন।

এই চক্ষু-বোজাই তাঁহার শেষ। কবিরাজের ওষুধের গুণে রাতটা কাটিল বটে। কিন্তু প্রভাতের টালে, তাঁহার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, কমলার চিন্তাবিমুক্ত হইয়া লোকান্তরে ছুটিয়া পলাইল। অভাগিনী পিতৃহীনা কমলা, মাতৃহীনা হইল। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই আমরা বলিয়া গেলাম।

(১৯)

সকল বিষয়েই বিধাতার এই সংসার নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। জড় ও মানুষ, উভয়েই এই পরিবর্ত্তনে স্রোতে অন্যরূপ হইয়া যায়। কমলাও এই সংসারের লোক। কাজেই তাহাদেরও একটা মস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

ষোড়শী যুবতী, তন্বঙ্গী, সুরূপশালিনী, কমলার পৈত্রিক-ভিটায় নানা কারণে অবস্থান করা হইল না। প্রথম—তাহার রক্ষকহীন অবস্থা। দ্বিতীয়—একা ঘরে থাকিতে তাহার মন টেকে না। সর্ব্বদাই মার কথা মনে পড়ে। আর রাত্রে একা থাকিতে ভয় করে।

যত দিন না শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হইল, ততদিন অপর্ণা আসিয়া কমলাদের বাটীতে ছিল। প্রসন্নকুমারের এক পিস্তুতো ভগ্নী ছিলেন। ইনিও প্রসন্নকুমারের অনুরোধে, সেই বাড়ীতে থাকিতেন। একজন ঝিও ছিল। দুইজন বিশ্বস্ত দরোয়ান বাহিরের

ঘরে থাকিত। তবু যেন সে বাড়ীতে থাকিতে, কমলার মন টেকে না। সর্ব্বদাই মার কথা মনে পড়ে—সে স্বপ্নের ঘোরে মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। অপর্ণা তাহার গা ঠেলিয়া স্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া দেয়, আর দু'জনে গল্প করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটায়।

বলা বাহুল্য, প্রসন্নকুমার বিন্দুবাসিনীর শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বেশ ব্যয় ভূষণ করিয়াছিলেন। যে বিন্দুবাসিনীকে তিনি জননীর মত ভক্তি করিতেন, তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়াটা যাহতে নিন্দনীয় না হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধ শান্তি চুকিয়া গেলে—একদিন প্রসন্নকুমার কমলাকে বলিলেন,—"যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। কষ্ট দুঃখ লোকের ত্ত চিরদিন থাকে না ত মা। জানিও কমলা! এ সংসারে বাঁচিয়া থাকাটাই খুব আশ্চর্য্য। কেউ আগে যায়, কেউ বা পিছনে পড়িয়া থাকে। তোমার মা স্বর্গে গেছেন কিন্তু আমি ত আছি। অপি ত আছে। তা তোমার কোন ভাবনা নাই মা। সদানন্দ তেলী তোমার বাড়ী চৌকী দিবে, বাড়ীতে সন্ধ্যাদীপ দেখাইবে সর্ব্বদা বাড়ী পরিষ্কার রাখিবে। তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে চল। অপির মা আজ বাঁচিয়া থাকিলে, কোন ভাবনাই আমার ছিল না। ধরিতে গেলে, তুমি ছেলে বেলা তার কোলে মানুষ হইয়াছিলে। এখন হইতে আমি তোমাকে কন্যার মত পালন করিব।

তাহার মা বাঁচিয়া থাকিলে কমলা খুব সম্ভবতঃ প্রসন্নকুমারের এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে পারিত না। কিন্তু এখন ত অসম্মত হইবার

উপায় নাই। কাজেই সে তাহার রাঙ্গাকাকার স্নেহভরা প্রস্তাবটী মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

প্রসন্নকুমার স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"এখন তো কোন আপত্তি করিলে চলিবে না, বা আমি তাহা শুনিব না মা! অপি আর তুমি দুজনেই মাতৃহীনা। আর তোমরা যেন একটী বোঁটায় দুটী ফুল। দুজনে একসঙ্গে, এক ঘরে থাকিলে, বোধ হয় তুমি অনেকটা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।"

কমলা, কাজে কাজেই প্রসন্নকুমারের সঙ্গে তাঁর বাটীতে চলিয়া গেল। ভিটা ছাড়িয়া যাইবার সময়, অবশ্য সে খুবই তার স্বর্গগতা জননীর জন্য কাঁদিয়াছিল। কিন্তু সে কান্না শুনিয়া ত সেই দিব্যলোকবাসিনী মা তাহার ফিরিয়া আসিল না। কাজেই পাষাণে বুক বাঁধিয়া, সে অপর্ণাদের বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সময়ের মতন শোকের নিদান পারদর্শী সুচিকিৎসক বোধ হয় আর নাই। মাতৃবিয়োগজনিত শোকে কমলার প্রাণে যে একটা ব্যথাময় ক্ষত হইয়াছিল, যতই দিন যাইতে লাগিল. সে ক্ষতটা ততই যেন শুথাইয়া আসিতে লাগিল।

শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী, অবশ্য তাহাদের বাড়ীতে কমলার আগমনে একটুও সন্তুষ্ট হয় নাই। কেন না—সে চিরদিনই আপন-সোহাগী। অপর লোকজনকে দুচ'ক্ষে সে দেখিতে পারে না। তবে মানুষের একটা চক্ষুলজ্জা ত আছে। কাজেই সে প্রসন্ন-কুমারের ভয়েই হোক, আর এই চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হোক, কমলাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না।

আর এরূপ করার কোন সুযোগও তাহার ঘটিত না। কেননা, অপর্ণা ও কমলা, অন্য এক স্বতন্ত্র মহলে থাকিত। বিরজা থাকিত উত্তর দিকে মহলে। কমলা ও অপর্ণা থাকিত, দক্ষিণ দিকের একটী ঘরে। এজন্য তাহাদের দেখাসাক্ষাৎও খুব কম হইত।

কমলা এই বিরজাকে বড়ই ভয় করিত। মানুষকে ভয় করিত না—ভয় করিত, তাহার কালকুটময় অসংযত জিহ্বাকে। কাজেই সাধ্যমতে বিরজার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, সে অপর্ণার কাছে দিনরাত থাকিতে ভাল বাসিত।

অপর্ণা ব্রহ্মচারিণী। ব্রাহ্মণের ঘরের পূণ্য চরিত্রা বিধবা। সে কাহারও হাতে খাইত না। এক বেলার একমুঠা আতপ, সে নিজেই পাক করিয়া লইত। প্রথম প্রথম, প্রসন্নকুমার এ সম্বন্ধে অনেক আপত্তি করিলেও তিনি তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। অপর্ণার আলাদা রান্নাঘর ছিল—ত্রিতলের উপরে।

কমলা আসার পর হইতে, সে দুই চারিদিন সরকারী হেঁসেলে খাইয়াছিল বটে—কিন্তু তাহা তাহার পক্ষে একটুও সুবিধাকর বোধ হইত না। কেন না বিরজা সেই সময়ে আহারে বসিত। তাহার সঙ্গে খাইতে বসিলে, কমলার মনে কি যেন একটা অজানিত কারণজাত লজ্জা ভয় ও সংকোচ উপস্থিত হইত।

অপর্ণার নিকট তাহার কোন কিছুই সংকোচের ছিল না। একদিন সে অপর্ণার নিকট তাহার মনোভাব কৌশলে ব্যক্ত করিয়া বলিল,—"অপি দিদি! আমি যদি তোর সঙ্গে এক হেঁসেলে খাই, তা হ'লে কি তোর অসুবিধা হবে ভাই?"

অপর্ণা বলিল—"আমার সঙ্গে খেলে আলোচালের ভাত, আর নিরামিষ্ তরকারী খেতে হবে। এ ব্রহ্মচর্য্য যে তোর পক্ষে বড়ই কষ্টকর হবে বোন্।"

কমলা হাসিয়া বলিল—"না দিদি! কোন অসুবিধাই আমার হবে না। আমি আজকাল আর রাঁধতে পাইনি বলে, মনে বড় একটা কষ্ট হয়! হাত পিষ্ পিষ্ করে। চিরদিন মাকে রেঁধে খাইয়েছি। এখন একেবারে বিরাম। বড় বোন তুমি মার মতন। না হয় তোমায় রেঁধে খাওয়াই।"

কেন যে কমলা একথা বলিতেছে, তাহার ভিতরের ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া, অপর্ণা কোন আপত্তি করিল না। সে বলিল— "তা হ'লে একদিন তুই রাঁধ্‌বি কমলি। আর একদিন আমি রাঁধ্‌বো। এই রকম পালা করে রাঁধতে যদি স্বীকার হোস্ তা হলে আমি রাজি।"

অপর্ণা বড় এক গুঁয়ে মেয়ে। সে যা ধরে, তা সহজে ছাড়ে না। কমলা তা জানিত। কাজেই সে তাহার এ প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিল না। তাহারা দুই জনেই ব্রহ্মচারিণীর উপযুক্ত শৌচাচারসমন্বিত সাত্ত্বিকভোজ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

(২০)

আজ কাল আর কমলার চুলে জট্ হয় না। যত্নের অভাবে তার সোণার অঙ্গে কালি পড়ে না। অপর্ণা নিত্য তার চুল

বাঁধিয়া দেয়। মায়ে যেমন মেয়েকে যত্ন করে, সে তাহার কমলিকে ঠিক সেইরূপই যত্নই করে।

একমাস হইতে যায়, কমলা অপর্ণার বাটীতে আসিয়াছে। এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিতেছে। আর অপর্ণার অত্যধিক আদর যত্নের জন্য, কমলার রূপজ্যোতিঃ যেন পূর্ণ সুষমা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ষার দুকুলপ্লাবী নদীতরঙ্গের মত, সে অপূর্ব্ব রূপরাশি কুলেকুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এমনি অপর্ণার যত্ন।

একদিন বৈকালে ছাদের উপর, অপর্ণা অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভ কিরণমাখা আকাশের নীচে বসিয়া কমলার চুলগুলি বাঁধিয়া দিতেছে। এমন সময়ে কমলা বলিল—"রোজ রোজ তুমি কেন এত কষ্ট কর দিদি!"

অপর্ণা বলিল—"কেন যে করি, তোর সে খোঁজের প্রয়োজন কি?"

কমলা। রোজ এই ভাবে চুল বেঁধে দাও, নূতন কাপড় চোপড় গয়না পরাও, এ সব দেখে কে?

অপর্ণা। আমি দেখি!

কমলা। তাতে তোমার কি সুখ!

অপর্ণা। সুখ না থাকলে এত মেহনত করি কেন? তবে আমার দেখায়, তোর মন উঠ্‌তে না পারে। আমার মনে একটা সুখ ও আনন্দ হ'লে, তোর সেটা না হ'তে পারে। তা যে দেখ্‌লে তোর প্রাণটা দশহাত ফুলে উঠ্‌বে, সে শীঘ্র আসবে বলেছে।

কমলা। আমি বুঝি তাই বল্‌ছি দিদি!

অপর্ণা। তা নয় তো কি লা পোড়ারমুখী! আমি বুঝি তোর চালাকি বুঝি না! শোন কম্‌লি! তবে আমার কথা। আমি বাবাকে বলে, সব ঠিক ঠাক করেছি। সেই বোনাই-ভাই এখানে এসে পড়লো বলে!

কমলা অপর্ণার কাছে এই মধুমোড়া খাইয়া, আর কিছু বলিল না। কিন্তু কমলার এই সহানুভূতি ও মহত্ত্বের জন্য, তাহাকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিল।

এইভাবে, অপর্ণা ও কমলার দিনগুলি কাটিতেছিল। কিন্তু তাহাদের এই সুখময় অবস্থাটা সেই বাড়ীর মধ্যে দুজন লোকের সহ্য হইতেছিল না। তাহারা আর কেউ নয়—বিরজা আর তার পরশ্রীকাতর গর্ভধারিণী।

বিরজা এই অভাগিনী কমলার কিরূপ শুভাকাঙ্ক্ষিণী, তাহা তাহাদের কথোপকথন হইতেই প্রমাণ হইবে।

প্রসন্নকুমার আজকাল অনেক রাত্রি ধরিয়া, জমীদারীর কাজকর্ম্ম করিতেন। অবশ্য এটা তাঁহার স্বেচ্ছাসৃজিত একটা অছিলা মাত্র। অন্দরে শয়ন করিতে, অধুনা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। কেন না, ব্যবহারগুণে আর আক্কেলের দোষে পত্নী বিরজার সাহচর্য্য তাহার চক্ষে বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। কিন্তু মা ও মেয়ে দুজনেই তখনও ঘুমায় নাই।

একটা নিত্য প্রথার অনুগামী হইয়া, এই গভীর রাত্রেই অর্থাৎ

যখন বাড়ীর আর সকলে ঘুমাইয়া পড়ে সেই সময়ে, মা ও মেয়ে তাঁহাদের মনের কথা বিনিময় করিয়া থাকে! তাহাদের মধ্যে যে সব কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা পাঠক-পাঠিকার একটু শুনিয়া রাখা উচিত!

বিরজার মা বলিতেছিল—"দেখ্ মা বিরু! কি আর বল্‌বো বল! আমার জামায়ের মতি গতি, দিন দিন যেন কি এক রকম হয়ে যাচ্ছে।"

বিরজা। তাকি আর বুঝ্‌ছি না মা! তা কি করবো বলো আমি? যেমন ঘরে আমায় দিয়েছিলে! জমীদার দেখে ভুলে গিয়েছিলে,—তার ফল এই। ধর্ত্তে গেলে, বাবা আমাকে একরকম জলে ফেলেই দিয়েছেন। কিন্তু জমীদারীর সুখ ত এই! হাত তোলার ভেতর থাকা। কথায় কথায় মুখনাড়া, আর চোখ রাঙ্গানি। আমার এক এক সময় ইচ্ছে হয়, হয় জলে ডুবে না হয় আফিং খেয়ে মরি।

বিরজার মা তখনই বলিয়া উঠিল—"ষাট্! ষাট্! ষেটের বাছা আমার! অমন অমঙ্গুলে কথা বলিস্‌নে মা! তুই আমায় ছেড়ে গেলে, আমি কোথায় দাঁড়াব বল দেখি! অই অপোগণ্ড ছেলে প্রসাদেরই বা কি দুর্দ্দশা হবে বল্ দেখি?"

বিরজা বলিল—"সবই বুঝি মা! কিন্তু আমার আর যে সহ্য হয় না। নিজের সংসারেই আমি যেন চোরের অধম হয়ে আছি। ঐ যে এক মেয়ে বিধবা হয়ে ঘরে এসে উঠেছেন, তাঁর ঠেকারই বা দেখে কে? না হয় আমি তার সৎমা। কিন্তু বাপের বিয়েকরা

পরিবার তো বটে। তা আমার সঙ্গেই ঠেকারে কথা কয় না। অহঙ্কারের মোদ্দাটা কি তা জানো, শ্বশুরের বিষয় আর মাসে একশো টাকা করে মাসহারা। তা ওরা দুটো জুটেছেও সমানে সমানে। একটার নেই—আর একটার থেকে নেই। অতবড় সোমত্তমাগী, সোয়ামী নিয়ে যাবার নামও করে না। কি করে মন বেঁধে আছে বল দেখি? আজকাল আবার মাছ-মাংস ছেড়ে শুদ্ধ আচারে অপর্ণার এক সঙ্গে নিয়ামিষ খাওয়া হচ্ছে।

বিরজার মা বলিল—"যা বল্‌ছো মা তার একটুও মিথ্যে নয়। এই যে আমাদের বামুন ঠাক্‌রুণ আছেন, তার প্রতি আমাদের মাসে খরচ পড়ে কত বল দেখি! রোজ রাত্রে দুআনা করে জলখাবার, খোরাক পোষাক, তার উপর মাইনে দশটাকা। তা বাম্‌নীটাকে ছাড়িয়ে দিয়ে, ঐ কমলাকে রান্নার কাজে দিলে ত এক রাশ টাকা মাসে বেঁচে যায়। আর সেই টাকাগুলো যদি তোমার হাত খরচ স্বরূপ দেন ত আমরা বর্ত্তে যাই।"

বিরজা বলিল—"ও সব কথা ছেড়ে দাওনা মা। তা রাধাও নাচবে না তেলও পুড়বে না। তোমার জামায়ের ন্যাকামি দেখে দেখে, আমার হাড়টা জ্বলে গেল। আমার কথা কাণে তুল্‌লে আজ কি ওঁর এমন ছন্নছাড়া দশা হয়। কুলীনের সোমত্ত মেয়ে, ঘাড়ে এনে তুলেছেন! এর পর মজাটা টের পাবেন। দেখো না কত কেলেঙ্কারি হবে।"

এই ভাবের কথাবার্ত্তার পর, বিরজা হাই তুলিতে লাগিল।

বিরজার মাতা বলিলেন,—"দেখ মা বিরু! তোমার ভাই ছুমাসের উপর মফিস্বলে গেছে। তা বাছা আমার একবারও এমন ছুটী পায়না, যে এখানে একবার আসে। তার চেয়ে বাছা যদি আমার কোম্পানীর আপিসে চাকরী কর্ত্তো, তা হলে ভাল ছিল! একটু ইংরিজি যদি তিনি শিখিয়ে যেতেন, তাহলে ঐ ছেলে নয় দারোগা না হয় হাকিম হতো! আহা! সেখানে হাত পুড়িয়ে, আধপেটা খেয়ে বাছা আমার নাজানি কতই রোগা হয়ে গেছে।"

এই ভাবেই হাউ হাউ করিয়া বিরজার মাতা, হয়ত সমস্ত রাত্রিই বকিয়া মরিতেন। কিন্তু কন্যার কোন সাড়াশব্দ হাঁ—হুঁ না পাইয়া বুঝিলেন, বিরজা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অগত্যা তিনিও বক্তৃতাস্রোত বন্ধ করিয়া চক্ষু মুদিলেন।

যেদিন গভীর নিশীথে এই বাড়ীর দূরবর্ত্তী একটী কক্ষে, কমলার বিরুদ্ধে এই ভাবের সমালোচনা চলিতেছিল সেইদিন অপর্ণা ও কমলা, তাহাদের কক্ষমধ্যে বসিয়া সেই নীরব নিথর রজনীতে চুপে চুপে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহা একবার আমাদের শোনা উচিত নয় কি?

আড়ি পাতিয়া কাহারও কথা শোনা রোগটা কমলা ও অপর্ণা দুইজনেরই ছিল না। সুতরাং চার পাঁচটী কক্ষের পরের একটী কক্ষে, অপর দিকের বারান্দার, বিরজা ও তাহার মার মধ্যে কি ভাবের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা তাহারা শুনিতে পায় নাই বা শুনিবার চেষ্টা করে নাই। কিম্বা তাহাদের বিরুদ্ধে যে এরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে পারে তাহাও ভাবে নাই! তাহারা তাহাদের

নিজের ভাবনাতেই অস্থির। অন্য বিষয়ে এত মাথা ঘামাইবার অবসর তাহাদের খুব কম।

তাহাঁর মুমূর্ষু জ্যাঠাইমার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া, অপর্ণা যে পবিত্র প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছে। বড়লোকের মেয়ে সে, জমীদারের বৌ সে, কাজেই অর্থ দ্বারা কমলার কষ্টময় জীবনের নিত্য অভাবগুলি যতটা মোচন করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা সে করিতে-ছিল। তাহার আলমারির টানার মধ্যে, পাটকরা অনেক ভাল কাপড় ছিল। তাহা সে কমলাকে পরাইত। না পরিলে খুব বকিত।

মা যেমন যত্ন করিয়া মেয়েকে খাওয়ায়, সেই ভাবেই সে তরিবৎ করিয়া সকালে তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইত। কমলার জন্য,সে এক-সের দুধ বরাদ্দ করিয়া ছিল। আলাদা হেঁসেলে তাহার জন্য আমিষ-পাকের ব্যবস্থাও সে করিয়া দিয়াছে। কমলা সকালে অপর্ণার সঙ্গে নিরামিষ খাইত বটে, কিন্তু বিকালে সে নিজের ইচ্ছামত মৎস্যাদি সংযোগে একটা তরকারী করিয়া লইত। এটা হইত কেবল অপর্ণার বকুনীর ভয়ে। কেননা অপর্ণা এরূপভাবে কমলাকে দুইবেলা নিরামিষ খাইতে দিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সধবা সে, মাছ না খাইলে স্বামীর অকল্যাণ করা হয়, এইজন্য সে কমলার দুইবেলা নিরামিষ ভোজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইত।

অপর্ণার দুই সেট্ গহনা। এক সেট্ সোণার, আর এক সেট্ জড়োয়ার। পাছে পুত্রবধুর নিকট নিকট হইতে এই

অলঙ্কারগুলি ফিরাইয়া লইলে, সে মনে দুঃখ করে, এজন্য অপর্ণার শাশুড়ী, তাহা অপর্ণার কাছেই রাখিয়া দিয়াছিলেন।

অপর্ণা দুই তিন বার বলিয়াছিল—"এসব জিনিসে আর আমার প্রয়োজন কি মা? তুমি রাখিয়া দাও।" শাশুড়ী একথায় চোখের জল ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—"ভগবান যখন তোমার সোনার অঙ্গ অলঙ্কার শূন্য করিয়া দিয়াছেন—তখন আমি সেই ভগবানের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন কিছু করিতে পারি না। তবে তোমার বারব্রত, ধর্ম্মকর্ম্ম তীর্থ ভ্রমণের জন্য, এর পর এই অলঙ্কারগুলি তোমার অনেক প্রয়োজনে লাগিবে। ইহা তোমার কাছেই রাখিয়া দাও।"

শাশুড়ীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, অপর্ণা কাজেই তাহার সমস্ত গহনাপত্র নিজের কাছেই রাখিয়া দিয়াছিল। আব ইহার মধ্য হইতে যেগুলি সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করা চলে, তাহার দুই একখানি দিয়া সে কমলার স্বাভাবিক সুকান্তির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়াছিল। আরও অলঙ্কার দিতে পারিত, কিন্তু বিরজার ভয়ে সে সাহস করিত না। কারণ সে যে দুই তিন খানি অলঙ্কার কমলাকে পরিতে দিয়াছিল, তাহাতেই বিরজার চক্ষু টাটাইয়া উঠিয়াছে। ঠারেঠোরে আভাসেইঙ্গিতে এই নীচহৃদয়া, স্বার্থপর বিরজা তাহা অপর্ণাকে জানাইতে ছাড়ে নাই।

তারপর অপর্ণা, মনে একথাটাও ভাবিয়া রাখিয়াছিল, যে উপায়ে হোক, কমলাকে তাহার স্বামীর কাছে পাঠাইতেই হইবে। সে যে কমলার সুখস্বচ্ছন্দ বিধানের একটা মহা দায়িত্ব লইয়াছে,

তাহা পূর্ণ করিতে গেলে, আগে এ ব্যবস্থা টুকুর খুবই প্রয়োজন!

এজন্য সে তাহার পিতাকে দিয়া, গোপাল গোবিন্দকে কয়েকখানি চিঠিও লেখাইয়াছিল। বিন্দুবাসিনীর শ্রাদ্ধের সময়, প্রসন্নকুমার জামাই গোপালকে আনিবার জন্য, একজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু গোপালগোবিন্দ খাজনা আদায়ের জন্য, কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে থাকায়, সে লোক ফিরিয়া আসে।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া গোপালগোবিন্দ প্রসন্নকুমারের লিখিত পত্র হইতে, সকল সংবাদই অবগত হইলেন। যখন তিনি দেখিলেন, কমলার রাঙ্গাকাকা জমীদার প্রসন্নকুমার, তাহার সমস্ত ভার লইয়াছেন, তখন শ্রীমান গোপাল বাবাজী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। আর সেই সঙ্গে এটুকুও মনে মনে ভাবিলেন—কমলাকে সুযোগ বুঝিয়া তাহার নিজ বাড়ীতে আনান বিশেষ প্রয়োজন। চিরদিন প্রসন্নকুমারের গলগ্রহ করাটা ঠিক নয়।

কিন্তু তখনও তিনি দেনার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাহার উপর তাঁহার বাড়ীঘরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ায়, তাঁহাকে দেনা করিয়া ঘরগুলি ছাওয়াইতে হইতেছে। আয়ের একটু স্বচ্ছল অবস্থা, আর শুইবার ঘর দুখানি ভাল করিয়া মেরামত না করিলে, কমলাকে সে বাড়ীতে আনা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

কমলার কলঙ্কশূন্য প্রাণের নিভৃত কন্দরে আশাতিরিক্ত স্নেহমায়া, ও স্বামীভক্তি যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, তাহা বুঝিয়া আর

তাঁহার অপর দুই পত্নীর গুণাবলীর সহিত তাহার একটা তুলনায় সমালোচনা করিয়া, গোপাল তাহার তৃতীয়া পত্নী কমলারই অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এটুকুও বুঝিয়াছিলেন, কুলীন সন্তান হইয়া তিনি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাহইলেও তাহার চিরদিনের বিষময় জীবনটাকে একটুও সুখময় করা, খুবই প্রয়োজন। এই দুই কুগুণশীলা পত্নী লইয়া ঘর করিলে, আজীবন তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে। জীবনেও তিনি দাম্পত্য-সুখ-লাভে সক্ষম হইবেন না।

অন্য সময় হইলে অর্থাৎ বিন্দুবাসিনী বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি হয়তো কমলাকে একবার দেখা দিয়া যাইতেও পারিতেন। কিন্তু অর্থহীনতার জন্য, তিনি তাঁহার স্বর্গগতা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধের সময়ে, লৌকতা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করা দূরে থাক্,—এ দুর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া একখানি পত্রও দেন নাই। এজন্য তিনি মনে মনে বড়ই একটা অনুশোচনা বোধ করিতেন।

প্রসন্নকুমার, গোপালগোবিন্দকে আনাইবার জন্য বড়ই উৎসুক ছিলেন। কেননা এই পিতৃমাতৃহীনা অভাগিনী কমলার সুখস্বচ্ছন্দ বিধানের ভার, তিনি তাঁহার স্বর্গগতা বধুঠাকুরাণীর রোগশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া লইয়াছিলেন। কমলার সম্বন্ধে তাঁহার সুবুদ্ধিমতী দয়াবতী কন্যা অপর্ণা যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা করিয়াছিল, প্রসন্নকুমার তাহাতেই একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংসারে ত অন্নের অভাব নাই। কমলা যতদিন ইচ্ছা করে,

এ সংসারে সে তাহার অভিলাষ মতই থাকুক না কেন। কিন্তু অন্নবস্ত্র আর অলঙ্কারে কি সতী নারীর সকল কষ্ট নিবারণ হয়? স্বামী-সাহচর্য্য লাভ করিয়া পতিব্রতা যদি শাকান্নে অতিকষ্টে জীবন-ধারণ করে, তাহাহইলেও সে যে রাজরাণী। এজন্য প্রসন্নকুমার ভাবিলেন, কমলাকে ষোল আনা সুখী করিতে হইলে, জামাতা গোপালকে আনিয়া সেই গ্রামে বাস করান প্রয়োজন।

গোপালকে তিনি ইতিপূর্ব্বে এসম্বন্ধে অনুরোধ করিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আর সে পত্রের উত্তরে জামতা গোপালগোবিন্দ, একটা জবাবও দিয়াছিলেন। সে জবাবের প্রকৃত মর্ম্ম সুবুদ্ধিমান্ প্রসন্নকুমারের বুঝিতে বাকি রহিল না।

এজন্য তিনি গোপালকে পুনরায় একখানি পত্র লিখিলেন। সে পত্রে যাহা লেখা ছিল, আমরা তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রসন্নকুমার লিখিলেন—"

বাবাজীউ কল্যাণবরেষু—নিরাপদেষু—

তোমার প্রণাম পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার স্বর্গগতা বধূঠাকুরাণী অর্থাৎ তোমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলার ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমিও ভগবানের কাছে—কমলার সুখস্বচ্ছন্দ বিধানের জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী। তুমি যে অর্থের অস্বচ্ছলতা ও ঘরদোরের অভাবের একটা আপত্তি তুলিয়াছ, তাহা আমি আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তুমি যদি মনে ভাবিয়া দেখ—তাহাহইলে তোমার এই ঘরদ্বারের কোন অভাব নাই। তোমার স্বর্গগতা শাশুড়ী ঠাকু-

রাণীর আর কোন সন্তানাদি নাই—সন্তানের মধ্যে ঐ একমাত্র কন্যা কমলা। এজন্য তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি কমলারই প্রাপ্য। তাঁহার সম্পত্তি এখনও যাহা আছে, তাহার মূল্য এই পল্লীগ্রামে চার পাঁচ হাজার টাকার কম নয়। তিনটী দোহারা পাকা কামরা, দশ বিঘার বাস্তু বাগান, বড় কম সম্পত্তি বলিয়া ভাবিও না। তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর শেষ আদেশ—"জামাইকে আনিয়া আমায় ভিটায় বাস করাইবে। কমলার একটা উপায় করিয়া দিবে।" আমিও তাঁহার এই আদেশ পালনে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। এজন্য আমার মনোগত ইচ্ছা, যে তুমি তোমার শাশুড়ীর ভিটায় আসিয়া, কমলাকে লইয়া ঘরকন্না কর। কেননা এখন তাহা তোমারই সম্পত্তি। আর তুমি যদি আমার এ অনুরোধ রক্ষা কর, তাহাহইলে আমিও প্রতিশ্রুতি করিতেছি—এসম্বন্ধে তোমার সম্মতি পাইলেই উক্ত বাড়ীঘর আমি নিজ খরচায় নূতন করিয়া মেরামত করিয়া দিব। অবশ্য ইহাতে তিন চারি শত টাকা খরচ পড়িবে। কিন্তু আমার পিতৃমাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলার একটা উপায় করিবার জন্য, এরূপ ব্যয়স্বীকার করিতেও আমি প্রস্তুত। তোমার অভিমত পাইলেই, আমি বাড়ী মেরামত সুরু করিয়া দিব।

আশীর্ব্বাদপত্রী—শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পুনশ্চঃ—

তোমার অপর দুই পত্নীকে যদি তুমি এই ভিটায় আনিয়া রাখিতে চাও, তাহাতে আমি বা কমলা সুখী বই অসুখী হইব না।

—প্রঃ

গোপালগোবিন্দ যখন এই পত্র পাইলেন, তখন তিনি আহ্লাদে আট খানা হইয়া উঠিলেন। যে শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের সময়, জামাতা হইয়াও, তিনি একটী টাকাও লৌকতা করিতে পারেন নাই, সেই শাশুড়ী বিনা অনুরোধে, বিনা প্রার্থনায়, স্বেচ্ছায়—

চারি পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি তাঁহাকে দান করিয়া গিয়াছেন।

গোপাল সানন্দ চিত্তে এই পত্রের উত্তরে লিখিলেন—"পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু। আমি বোধ হয় এক সপ্তাহের মধ্যে গিয়া আপনার শ্রীচরণদর্শন করিব। সাক্ষাতে আমাদের সমস্ত কথাবার্ত্তার মীমাংসা হইবে।"

এই প্রতিশ্রুত সাতটী দিনের, পাঁচটী দিন ইতিপূর্ব্বেই কাটিয়া গিয়াছে। গোপালকে যে সমস্ত পত্রাদি প্রসন্নকুমার লিখিতেন, তাহা অপর্ণাকে একবার না শুনাইয়া, ডাকঘরে পাঠাইতেন না। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব পত্রোলিখিত সমস্ত কথাই অপর্ণা জানিতে পারিয়াছিল। অপর্ণাকে এই সব দেখানর উদ্দেশ্য এই, যে অপর্ণা কমলাকে এসব কথা শুনাইবে। আর এইরূপ ব্যবস্থায় তাহার স্নেহভাগিনী কমলা, ভবিষ্যৎ সুখের আশায় অনেকটা প্রফুল্লচিত্ত থাকিবে।

এ সব কথা থাক। কমলা ও অপর্ণা দুইজনে দ্বিতলের কক্ষের দরোজাটী বন্ধ করিয়া দিয়া চুপিচুপী কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহা শুনিয়া আসা যাউক।

অপর্ণা বলিল—"কমলি! যদি বোনাই আসে, আর তোকে লইয়া তোদের বাড়ীতে থাকিয়াই ঘরকন্না করে, তাহা হইলে তুই আমাকে ছাড়িয়া যাইবি ত?"

এইরূপ দুষ্টামিপূর্ণ কথায়, অপর্ণা কমলাকে উত্যক্ত করিয়া একটু আনন্দ বোধ করিত। আর কমলা সেটুকু জানিত বলিয়া

এ সব উদ্ভট প্রশ্নে একটুকুও বিরক্ত হইত না। কেন না অপর্ণা কমলার সুখ-স্বচ্ছন্দগুলিকে এখন তাহার নিত্য চিন্তার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। আর কমলা ইহা বুঝিত বলিয়াই, অপর্ণার এই সব দুষ্টামি আর বকুনি মুখ বুঝিয়া সহ্য করিত।

এজন্য কমলা বলিল—"তা কেন যাব দিদি! আমি তোমার কাছেই থাক্‌বো!"

অপর্ণা। আর বোনাই বুঝি গোয়াল-ঘর আলো করে খোঁটায় বাঁধা থাকবে?

কমলা। সেটা তুমি জান!

অপর্ণা। শোন কম্‌লি! আর মাঝে দুটো দিন বই'ত বাকী নেই। তারপব তোর নারায়ণ দর্শন হবে! বুঝেছিস ত, আমার অবশ্য এটা ইচ্ছা নয়—যে তোর, সেই কালপ্যাঁচা সতীনদুটো তোর ঘরবাড়ী দখল করে বসবে, স্বামীকে দখল করে ফেল্‌বে, আর তোর মত সোণার-পদ্ম ধুলোয় পড়ে গড়াবে। আর তুই আমার কাছে শুয়ে কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলবি। এ সব আমার নিশ্চয়ই সইবে না। তা—তুই আমায় যাই বল্‌।

কমলা—অপর্ণা চরিত্রের মহত্ত্ব বুঝিত। কাজেই সে অপর্ণার কথার উত্তরে বেশী কিছু না বলিয়া কেবল'মাত্র বলিল, "তোমাদের যা ভাল বোধ হয়—তাই করো দিদি!"

অপর্ণা বলিল—"শোন পোড়ারমুখী! তুই আমার কাছে আসা অবধি, আমার আর সব চিন্তা গুলো, জোর বাতাসের মুখে পেঁজা—তূলোর মত কোথায় যেন উড়ে চলে গেছে। এই

চাবি

দুদিন বাদে বোনাই যদি আসেন, তাহলে আমি আমার পাশের ঘরে, তোর থাকবার বন্দোবস্ত করে দোব, আর আড়ালে থেকে আড়িপেতে তোদের সব কথা শুন্‌বো।"

কমলা হাসিয়া বলিল—"আমরা কোন কথা কহিলে তো।"

অপর্ণা। কি—কথা কইবি না! কইতেই হবে। স্বামী এমন পরশ পাথর, যা ছুঁলে তোর মত রাঙ্গও সোনা হয়ে যাবে। তোর মত মুখ বোবার মুখেও বক্তৃতার ভাদুরে বাণ ছুটে যাবে! ওলো—এ দুদিনের মধ্যে যে আমি মরে যাব কম্‌লি তা ভাবিস্‌ নি। দেখ্‌বো তখন কি করে তুই চুপ করে মুখ বুজে থাকিস্‌!"

কমলা—স্বভাবতঃই একটু বেশী লজ্জাশীলা। এজন্য সে অপর্ণার কথার উত্তরে আর কোন কথাই বলিল না। সে কেবল মনে মনে নারায়ণকে ডাকিয়া বলিল—"হে ঠাকুর! একবার সেই স্বামী দেবতাকে আমার কাছে আনিয়া দাও। এখন আর আমার মা নাই, যে আমাকে দেখিবে। তিনি ভিন্ন আমার আর কে আছে ঠাকুর?"

(২১)

বিশ্ববিজয়ী এলেকজান্দারের মত দর্পিত হৃদয়ে, আমাদের প্রসাদ বাবাজীউ, মফঃস্বলের কাছারি হইতে বাড়ী ফিরিয়াছেন। প্রসন্নকুমার জানিতেন না, প্রসাদ তাঁহাকে না জানাইয়া, সহসা মহল ছাড়িয়া, এ ভাবে বাড়িতে আসিবে।

প্রসাদ যখন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময়ে প্রসন্নকুমার তাঁহার দপ্তরখানায় বসিয়া, সরকারী কাগজপত্র

দেখিতেছিলেন। সহসা প্রসাদকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, প্রসন্নকুমার একটু চিন্তিত মুখে বলিলেন—"কেমন আছ তুমি রামপ্রসাদ? এই আদায়পত্রের সময়ে, মহল ছাড়িয়া সহসা চলিয়া আসিলে যে?"

কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া প্রসাদ আজ কাল একটু বেশী চালাক-চতুর হইয়াছে। সে ভক্তিভরে ভগ্নিপতির পদধূলি লইয়া বলিল—"আজ্ঞে সমস্ত কাজ কর্ম্মের বন্দোবস্ত করে দিয়ে, তবে আমি কাছারি ছেড়ে এসেছি। আর কিছু টাকাও এনেছি।"

প্রসন্ন। কতটাকা এনেছ?

প্রসাদ। আজ্ঞে পুরা পাঁচশোই এনেছিলুম। তবে তার ভেতর থেকে পাঁচটী টাকা রাহা খরচ করে এসেছি।

প্রসন্ন। এই এক মাসে মোটে পাঁচশো টাকা আদায় হলো? এখনও যে আমার আরো পনেরোশো টাকা চাই। পুজা সম্মুখে। সরকারী খাজনার কিস্তি আগত প্রায়। কিসে যে কি হবে তাত বুঝ্‌ছিনি। সে হতভাগা নিবারণটা কি আজকাল কোন কিছুই দেখে না?

প্রসাদ। তা আর দেখ্‌ছেন কই? এই পাঁচশো টাকা যা আজ এনেছি, এটা আমার নিজের চেষ্টাতেই আদায় হয়েছে!

প্রসন্ন। তা তুমি আমায় পূর্ব্বাহ্নে কোন সংবাদ না দিয়ে, এখানে চলে এলে কেন? কাজটা ভাল কর নি!

প্রসাদ। তা বুঝছি বটে। কিন্তু একটা কারণে মনের অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায়, আমাকে সহসা চলে আসতে হয়েছে। তা

আমি চার পাঁচ দিন এখানে থেকেই আবার কর্ম্মস্থানে চলে যাবো।"

প্রসন্ন। তা তোমার মনের অবস্থাটা, সহসা এত খারাপ হবার কারণ কি প্রসাদ ?

প্রসাদ। আমি আপনার আর দিদির নামে ভয়ানক একটা তুঃস্বপ্ন দেখে, তু'দিন রাত্রে ঘুমুই নি। কেবল যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেছি। শেষ না থাকতে পেরে, একবার আপনাদের দেখবার জন্য, আর টাকাগুলি পৌঁছে দেবার জন্য, আমাকে সহসা চলে আসতে হয়েছে।

প্রসন্নকুমার কথাটা শুনিয়া একটু ভ্রুকুটিভঙ্গী করিলেন। প্রসাদ তাহা লক্ষ্য করিল বটে, কিন্তু কিছু বলিল না। প্রসন্নকুমার বলিলেন—"ভাল! ঐ টাকাটা তবে আমায় দিয়ে যাও। এখন তুমি উপরে গিয়ে কাপড়চোপড় ছেড়ে ঠাণ্ডা হওগে। এর পর আমাদের কাজ কর্ম্মের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হবে।"

প্রসাদ ভগ্নিপতির কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, অন্দর মহলে প্রবেশ করিল। রান্নাঘরের দালানের সম্মুখেই মার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রসাদজননী রান্নাঘরের দাওয়ায় দাড়াইয়া ঝির মাছ কোটার তদারক করিতেছিলেন। আর তাঁহার কন্যা বিরজা রান্নাঘরের মধ্যে বামুনঠাকরুণের পিছনে দাঁড়াইয়া, রান্নার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিল।

পুত্রকে সহাস্যমুখে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বিরজা জননী আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিলেন। "ওমা! একি আশ্চর্জ্জি গো! ও মা বিরু! দেখে যা তোর ভাই এসেছে।"

মাতার উল্লাসময় চীৎকারে, বিরজা বাহিরে আসিয়া প্রসাদকে, দেখিয়া বলিল "কিরে প্রসাদ! সহসা মহল থেকে চলে এলি যে?"

প্রসাদ তাহার আসার সম্বন্ধে প্রসন্নকুমারকে যে ভাবে কৈফিয়ৎ দিয়াছিল, ভগ্নির নিকটেও ঠিক সেই কৈফিয়ৎ দিল।

বিরজার মাতাঠাকুরাণী বলিলেন—"দেখলি বিরু! পেসাদের আমার দিদিঅন্ত প্রাণ। খারাপ স্বপন দেখে, বাছা আমার তিষ্ঠুতে না পেরে, হন্নেমুখো হয়ে ছুটে এসেছে। তা ঐ বোন—আর ভগ্নিপোত ছাড়া, এ পিরথিমিতে ঐ অপোগণ্ডের আপনার বলতে ত আর কেউ নেই!"

বিরজা ভাইকে বলিল—"যাও প্রসাদ উপরে! কাপড় চোপড় ছেড়ে ঠাণ্ডা হও গে। আমি এখানকার কাজ সেরে উপরে যাচ্ছি।"

মাতা অগত্যা পুত্রের অনুসারী হইলেন। প্রসাদ জামা কাপড় ছাড়িলে—মা বলিলেন—"আহা! বাছা আমার আধখানা হয়ে গেছে। কি রোগাটাই হয়ে গেছে গা। আয় বাপ্! বোস্ দেখি এখানে। একটু বাতাস করি।"

ধরিতে গেলে, প্রসাদবাবুর শরীর রোগা হইয়া যাওয়ার কোন লক্ষণই ছিল না। বরঞ্চ তাহার শরীর ক্রমশঃ মোটা হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাতৃস্নেহের মমতাময় দৃষ্টির মুখে, তাহার শরীরের খারাপ অবস্থাটাই সেই স্নেহময়ী জননীর চোখে পড়িল।

মাতৃস্নেহোদ্বেলিত রামপ্রসাদ বলিল—"তা কি করবো মা! যখন

যেমন তখন তেমন। নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাই, কাজেই শরীর ফুলবে কি করে ?"

লোকে আদালতে সত্যপাঠ করিয়া বলে—"এই মোকদ্দমায় যাহা কিছু বলিব, তাহার সবই সত্য।" কিন্তু আমাদের আদুরে গোপাল প্রসাদবাবু, প্রসন্নকুমারের বাটীতে প্রবেশ সময়ে বোধ হয় এই ভাবের সত্যপাঠের বদলে, একটা "মিথ্যাপাঠ" পড়িয়া বাড়ী ঢুকিয়াছিল। কেননা সে প্রথম দফায় প্রসন্নকুমারের কাছে যে ভাবে মিথ্যাকথা বলার সুরু করিয়াছে, ইহার শেষ কোথায় হইয়াছিল, তাহা একটু পরেই প্রকাশ পাইবে।

এই সময়ে বিরজা সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। মাতা কন্যাকে দেখিয়া মায়া জানাইয়া বলিলেন—"দেখলি মা বিরু! যা ভেবেছিলুম তাই! পেসাদ আমার আধখানা হয়ে গেছে।"

বিরজা মাতার এই অতিশয়োক্তিতে, মনে মনে বিরক্ত হইয়া মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিল না। ভ্রাতার সেই নধর কান্তির মধ্যে কষ্ট-দুঃখের কোন চিহ্নই সে দেখিতে পাইল না। বিরজা তাহার ভাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"কিরে প্রসাদ! কত টাকা আন্‌লি এবার ?"

প্রসাদ বলিল—"তোমার আশীর্ব্বাদে দিদি এবার পাঁচশো টাকা আদায় করে এনেছি।"

সমুখেই প্রসাদের ব্যাগটী পড়িয়াছিল। বিরজা আশালোলুপ চিত্তে বলিল—"কই ব্যাগের চাবিটা একবার খোল্ দেখি। কেমন পাঁচশো টাকা এনেছিস্ দেখি।"

প্রসাদ বলিল—"টাকা কি আর উপরে আনতে পেরেছি দিদিমণি! দপ্তরখানায় চাটুয্যে মশাই বসেছিলেন। বাড়ীতে ঢোক্‌বা মাত্রই টাকাগুলি তিনি সব নিয়ে নিয়েছেন।"

এইভাবে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করায়, বিরজার একটু গুপ্ত স্বার্থ ছিল। সে তাহারি চুড়ীগুলি নূতন করিয়া গড়াইতে দিয়াছে। এদানীং প্রসন্নকুমারের মুখে সর্ব্বদাই একটা বিরক্তির ভাব দেখিয়া সে স্বামীর নিকট মুখ ফুটিয়া টাকাকড়ি কিছুই চাহিত না। বিরজা মনে ভাবিল—"প্রসাদের আনীত টাকা হইতে যদি সে দুইশত টাকা যদি বাহির করিয়া লয়, তাহাহইলে এজন্য স্বামীর কাছে হাত পাতিতেও হইবে না। অথচ তাহার চুড়ী ভাঙ্গিয়া গড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাটা অতি সহজে আদায় হইয়া যাইবে।

প্রসাদের কথায় বিরজা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—"বুদ্ধিহীন কোথাকার! টাকাটা তাঁকে সাত তাড়াতাড়ি দিতে গেলি কেন বল দেখি তুই?"

প্রসাদ বলিল—"তা কি করবো দিদি! টাকার মালিক হচ্ছেন বোনাইবাবু। তিনি যখন চাইলেন, তখন না দিয়েই বা করি কি? আমার হয়েছে ঠিক যেন মারীচের দশা। রামে মারলেও মারবে। রাবণে মারলেও মারবে।

বিরজা প্রসন্নকুমারের উপর একটু ঝাল ঝাড়িয়া বলিল—"কেন আমি কি জোয়ারের জলে ভেসে এসেছি না কি? টাকা-গুলো সাত তাড়াতাড়ি অমনি চেয়ে নেওয়া হয়েছে। দেখ একবার মনের কুঁজ্‌ড়োমিটা। যা হয়ে গেছে তার চারা নেই। কিন্তু

এবার যখন টাকা আনবি, আমায় না জানিয়ে ওর হাতে দিস্‌নি।"

বিরজার মাতা, কন্যার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল—"সত্যি বটে বাবু! এমন ঘেন্নার কথা আর কখনও আমি শুনিনি। তা তুই আর জন্মে জামাইকে কিছু দিয়ে আসিস নি, এ জন্মে পাবি কেন বাপু!

এই টাকা সম্বন্ধে ভিতরের কথা কিন্তু অন্যরূপ। এই সুচতুরা বিরজার ভাইতো এই প্রসাদ! বাহিরে সে যতটা মূর্খতার ভাণ করিত, ভিতরে সেরূপ নিরেট ছিল না। প্রসাদ সত্যসত্যই এবার হাজার টাকা আনিয়াছিল। সে মনে ভাবিয়াছিল, এই হাজার টাকা একেবারে সব দিব না, এক দফায় পাঁচশো দিব আর পাঁচশো চাপিয়া রাখিব। বাড়ী গিয়া বেশীদিন ত থাকিতে পারিব না। যে বাঘের বত বোনাই, দুদিনের পরই হয়ত বলিবে—যাও মফঃস্বলে। একটা অছিলা না হইলে ত আবার বাড়ী আসিতে পারিব না। এইজন্যই প্রসাদ কৌশল করিয়া বাকী পাঁচশত টাকা তাহার ব্যাগের চামড়ার তলায় মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এই টাকা দিবার অছিলা করিয়া আর সপ্তাহ খানেক পরে সে আবার বাড়ীতে আসিতে পাইবে ইহাই তাহার মনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিরজা যদি তাহাকে ব্যাগটী খুলিতে বলিত, তাহাহইলেই মহা বিভ্রাট ঘটিত। আর ব্যাগটা ওরূপভাবে অনাদৃত অবস্থায় মেজের উপর পড়িয়া আছে দেখিয়া, বিরজার মনেও কোন সন্দেহ হইল না, যে ব্যাগের মধ্যে পাঁচ পাঁচশো টাকা থাকা সম্ভব। যাই

হোক, ব্যাপারটি এইখানেই খতম হইয়া যাওয়ায়, প্রসাদ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া,তৎপরক্ষণেই তাহার এই ব্যাগটী সে তাহার টিনের পেটরার মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে ভুলিল না।

(২২)

মধ্যাহ্নের আহারান্তে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, প্রসাদ তাহার নিজের ঘরে বসিয়া তামাকু খাইতেছিল আর নিবারণের মত একান্ত-সমর্পিতপ্রাণ বন্ধুলাভ করা যে খুবই সৌভাগ্যের কথা, এই কথাটাও সেই সঙ্গে মনোমধ্যে আলোচনা করিতেছিল।

এই নিবারণের পটলমণি খুব সেয়ানা মেয়ে। তাহাকে আয়ত্ব করিতে না পারিয়া, রামপ্রসাদ একটু সসেমিরে অবস্থায় পড়িয়াছিল বটে। কিন্তু আশাদেবী অনেক জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে মানুষকে, একটু আনন্দে রাখেন, তাহার বিষময় জীবনটাকে সুখময় করিয়া দেন। রামপ্রসাদ ভাবিল—আরও কিছুদিন না হয় যাক্। এখন পটলের সহিত কোনরূপ পীড়াপীড়ি করিতে গেলে নিবারণ চটিয়া যাইবে! সুতরাং সে চোখ বুজিয়া এই পটলমণির সহিত কি উপায়ে একটু বেশী গোছের আত্মীয়তা করা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতেছিল।

এমন সময়ে তাহার জননী আসিয়া বলিলেন—"সেখানে ত ভাল রকম জলখাবার খাওয়া হতো না প্রসাদ! তোমার দিদি তোমার জন্যে দু দশখানা ফুলকো লুচি, আর এই হালুয়াটুকু পাঠিয়ে দিয়েছে। খাও দেখি তুমি!"

প্রসাদ বলিল—"আজ একটু বেলায় ভাত খেয়েছি মা। এখন আর জল টল খাবো না।"

মাতা কিন্তু কোন মতেই ছাড়িলেন না। বলিলেন—"না খেলে বিরু বড্ডো রাগ করবে।"

প্রসাদ সত্য সত্যই ন্যাকামি করিতেছিল। তাহার রাক্ষসী-ক্ষুধা যে জঠরের এক কোণে, ধিকি ধিকি করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল, তাহা যে সে না বুঝিয়াছিল তা নয়। কাজেই সে সেই কয়খানি ফুল্‌কো-লুচি উদর নামক মহাগর্ত্তে প্রেরণ করিয়া, বারান্দায় হাত ধুইতে আসিল।

সহসা তাহার দৃষ্টি বারান্দার অপর পারে পড়িল। ঠিক যেন একখানা জলন্ত বিদ্যুতের জ্যোতির মত অপূর্ব্ব রূপশালিনী কে একজন, তাহাব নেত্রদুটিকে ঝলসাইয়া দিল। রামপ্রসাদের উৎসুক দৃষ্টি অপরদিকের সেই বারান্দাতেই আবদ্ধ হইয়া রহিল।

এই সুন্দরী রমণী আমাদের কমলা। কমলা জানিত না, রামপ্রসাদ তাহার ঠিক বিপরীত দিকের ঘরে আছে। ঘটনাচক্র চালিত হইয়া, অর্থাৎ সে অপর্ণার নিকট তাড়া খাইয়া, বারান্দায় তাহার ভিজে চুলগুলি শুখাইতে আসিয়াছিল।

রামপ্রসাদ এই কমলাকে ইতিপূর্ব্বে আরও দুই চারিবার দেখিয়াছিল। নূতন খুড়ীমার ভাই বলিয়া কমলা ইতিপূর্ব্বে প্রসাদের সঙ্গে দুই চারিটা কথা যে না কহিত তাহা নয়। অর্থাৎ সে যখন তার মার সহিত আগে আগে অপর্ণাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত, রামপ্রসাদ তখনও তাহাকে দেখিয়াছিল। কিন্তু তারপর

পূর্ণ যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, কমলা যে এতটা সুন্দরী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া সে বড়ই বিস্মিত হইল।

রামপ্রসাদ মনে ভাবিল, কমলা আগে আগে যে ভাবে এই বাড়ীতে বেড়াইতে আসিত, সে দিন হয়তো সেই ভাবে সে অপর্ণার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। সে তাহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতাকে বলিল—"বারান্দায় দাড়িয়ে যে মেয়েটী চুল শুখাচ্ছিল সে ওবাড়ীর কমলা না মা?"

মাতা দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—"হাঁ কমলাইত বটে। তা তুমি বুঝি ওদের ব্যাপার সব কথা শোননি?"

এই বলিয়া প্রসাদজননী বিন্দুবাসিনীর মৃত্যু, কমলার প্রসন্নকুমারের গৃহে আগমন—অপর্ণা ও কমলার একপ্রাণতা, একত্রে অশন বসন-শয়ন, আলাপন বিশ্রাম, সম্বন্ধে সব কথাই বলিল।

মাতা কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, রামপ্রসাদ মনে মনে বলিল—"প্রকৃত কুলীনের ঘরে জন্মেছে, তাতে আবার গরীবের হাতে পড়েছে। কিন্তু কি রূপ ঐ কমলার! হুঁ—যদি বিয়ে কর্ত্তে হয়, ঐ রকম রূপসীকেই ঘরে আনা উচিত। ঠিক যেন বিধাতার নিজের হাতে গড়া সোনার প্রতিমা। কি সুন্দর রং। কি সুন্দর মুখ চোখ! শ্যামা ঠাকুরুণের মত কি সুন্দর কালো চুলের রাশ। এই কমলার রূপ দেখ্‌ছি ইহুদি আরমানির উপরে উপরে চ'লে যায়। আর একবার ওকে ভাল করে দেখ্‌তে হলো। আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!"

অপরাহ্নপূর্ব্বে, রামপ্রসাদ একটা অছিলা করিয়া অপর্ণার সঙ্গে

দেখা করিতে তাহার কক্ষে আসিল। অপর্ণা তখন মেজের উপর বসিয়া কমলার চুল বাঁধিয়া দিতেছে।

রামপ্রসাদ দ্বারের অন্তরাল হইতে, নির্নিমেষলোচনে, চোরের মত লুকাইয়া, আবার সেই রূপরাশি দেখিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ-স্রোত বহিতে লাগিল।

কিন্তু এভাবে দেখাটা ঠিক নয় ভাবিয়া, সে দরজার নিকটস্থ হইয়া একটা গলাখাঁকারী দিয়া বলিল—"অপু! তুমি কেমন আছ মা?"

কমলা প্রসাদের আওয়াজ শুনিয়া তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় সামলাইয়া লইল। অপর্ণাও তাহার গুণধর মামাবাবুর গলার আওয়াজ পাইয়া, বাহিরে আসিয়া বলিল—"প্রসাদ মামা যে! কখন এলে তুমি?"

রামপ্রসাদ বলিল—"এই ঘণ্টাকয়েক আগে এসেছি। ভোরে উঠে ট্রেণ ধর্ত্তে হয়েছিল বলে, কাল রাত্রে আর একটুও চোখ বুজতে পারি নি। এইজন্য খেয়ে দেয়েই শোবামাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তা আমি, বোধহয়, আবার কাল কি পরশু চলে যাব। একমাস তোমায় দেখিনি—তাই একবার দেখা কর্ত্তে এলুম।"

অপর্ণা বলিল—"তা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন মামা? ভিতরে এসে বসো না।"

রামপ্রসাদ ভিতরে প্রবেশ করিয়া, একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিল—"ওটি আমাদের ও বাড়ীর কমলা না? ও কমলা! তুমি আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না নাকি?"

কমলা, রামপ্রসাদের মুখে একটা অসম্ভব উল্লাসময় ভাব দেখিয়া, একটু সংকুচিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল—"চিনতে আর পাচ্ছি না মামা বাবু!"

প্রসাদের দুই দণ্ড সেখানে বসিয়া, কমলার সঙ্গে এইভাবে দুই চারিটা কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহাতে একটা বাধা পড়িল। কেন না সেই সময় রুদ্রপিসি দ্বার প্রান্তে আসিয়া হাঁকিলেন—"ওমা অপু! ও কমলা! তোমরা কেমন আছ গো!"

তাহার অন্ধকারময় বুকের ভিতর কমলার রূপের একটা উজ্জল ছবি আঁকিয়া লইয়া, রামপ্রসাদ রুদ্রপিসিকে মনে মনে অভি-সম্পাত করিতে করিতে, সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

রামপ্রসাদ যে রুদ্রপিসিকে চিনিত না—তা নয়। পিসিকে সে বহুবার তাহাদের সেই বাটীতেই দেখিয়াছিল। পিসিব সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তাও সে বহুবার কহিয়াছে। কিন্তু বিরজার মাতার সহিত সেই অসরসের পর হইতে, পিসি ঠাকুরাণী এই দলের তিন জনের উপর ভারি অসন্তুষ্ট। পিসি, সুতরাং রাম-প্রসাদকে যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। আর তিনি কোনরূপ কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা না করায়, রামপ্রসাদও কোন কথা না কহিয়া বাহির বাটীতে চলিয়া গেল।

(২৩)

আবার দয়াল হরি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কমলার অদৃষ্ট পুনরায় প্রসন্ন হইল! গোপালগোবিন্দ ঠাকুর, যথা সময়ে কুঁদগাঁয়ে

প্রসন্নকুমারের বাটিতে দেখা দিলেন। আর এই সংবাদটা অপর্ণার ঝি; তখনই অপর্ণার কাছে অন্দর মহলে পৌছাইয়া দিল।

অপর্ণার মুখে একটা আনন্দের মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের মধ্যেও একটা উল্লাসের স্রোত বহিতে লাগিল। সে আনন্দ স্রোতবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, অপর্ণা আদরের সহিত কমলার রাঙ্গা গালদুটি টিপিয়া দিয়া বলিল—"ওলো কমলি! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলি লো! আজ যে তোর নারায়ণ এসে পৌঁছেচে।"

কমলা বলিল—"যার মুখ দেখে রোজই উঠি দিদি, আজ তার মুখ দেখেই ত উঠেছি।"

বলাবাহুল্য, কমলা ও অপর্ণা নিত্য এক শয্যাতেই শয়ন করে। তাই সে এ কথা বলিল। তারপর সে রান্নাঘরের কাজকর্ম্ম করিতে উপরে চলিয়া গেল।

এই সময়ে প্রসন্নকুমার সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরের মধ্যে রহিল কেবল অপর্ণা ও রুদ্র পিসি।

প্রসন্নকুমার সস্মিত বদনে বলিলেন—"কি পিসিমা! আজকাল যে তোমার পায়ের ধূলা আর এ বাড়ীতে পড়ে না।"

রুদ্রপিসি একবার মনে ভাবিলেন—বিরজার মার গুণের কথা প্রসন্নকুমারকে বলিয়া গেলেন। কিন্তু কি ভাবিয়া, তিনি তখনই তাঁহার অসংযত, পরনিন্দাপরায়ণ জিহ্বাটিকে সংযত করিয়া বলিলেন "এখন আর সময় পাই কই বাবা পেসন্ন! তা যেখানেই থাকি না কেন, রাত্রিকালে প্রাতঃবাক্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি,

তোমার খুব বাড়বাড়ন্ত হোক। ভগবান তোমাকে মনের সুখে রাখুন। কুলেশীলে, ধনেমানে, তোমার মত এ গাঁয়ে আর কে আছে বাবা পেসন্ন!"

প্রসন্নকুমার সহাস্যমুখে বলিলেন—"সবই তোমার আশীর্ব্বাদে যে পিসিমা।" এই বলিয়া তিনি অপর্ণাকে বলিলেন—"একবার এই দিকে আয়তো অপু! তোকে একটা কথা বলে যাই।"

অপর্ণা, পিসিমাকে বলিল—"তা হ'লে একটু বোস পিসিমা। বাবা কি বলেন একবার শুনে আসি।"

অপর্ণার ঘরের পাশেই, একটী কম চওড়া বারান্দা। প্রসন্নকুমার সেই বারান্দায় গিয়া, অপর্ণাকে বলিলেন—"অপু! জামাই গোপাল-গোবিন্দ ত এসে পড়েছে। এখন ব্যবস্থা করা যায় কি?"

অপর্ণা, ক্ষণকাল মনোমধ্যে কি ভাবিয়া বলিল—"তার জন্য ভাবনা কিসের বাবা! আমাদের ত ঘরের অভাব নাই।"

প্রসন্ন। ঘরের জন্য একথা বলিনাই মা। বল্‌ছি, ভবিষ্যতের কথা। কমলার নিজ বাড়ীখানা এখন গোপালের সম্পত্তি—আর গোপাল যদি কমলাকে নিয়ে ঘর করে, তা হ'লে ঐ বাড়ীতেই ওদের থাকা উচিত। আমি গোপালের সঙ্গে এ সম্বন্ধে সব কথা শেষ ক'রে তা হলে কাল থেকেই বাড়ী মেরামতের জন্য লোক লাগিয়ে দোব! তোর নতুন মার বাক্যগঞ্জনা থেকে তা হলে আমি যেন বেঁচে যাই!"

প্রসন্নকুমার একটু অসাবধান হওয়ায়, হঠাৎ এ কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। অপর্ণা এটুকু জানিত না, যে কমলাকে তাহাদের

বাটীতে আনার জন্য, তাহার পিতাকে বিমাতার নিকট বাক্যগঞ্জনা সহিতে হইতেছে।

অপর্ণা বলিল—"বাবা! কমলা যদি এ গঞ্জনার কথা শোনে, তাহ'লে সে হয়তঃ মনে দুঃখ করবে। এ সব কথার আলোচনায় এখন কোন দরকার নেই। তুমি যা ভাল বুঝবে বাবা! তাই করো। আমাব এমন কি বেশী বুদ্ধি, যে তোমায় আমি এ সম্বন্ধে পরামর্শ দোব।"

প্রসন্নকুমার বলিলেন—"আচ্ছা! সে সব কথা পবে হবে। এখন জামাতার যাতে আদর যত্নটা ভাল রকম হয়, তাব উপস্থিত ব্যবস্থা করে দাও। তোমার যা যা জিনিস চাই, তাহা বুড়ো ঝিকে দিয়ে বলে পাঠাও—আমি এখনি সব জোগাড় করে দিচ্ছি।"

এই কথা বলিয়া, প্রসন্নকুমার বাহিরের বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে গোপালগোবিন্দ তামাকু খাইয়া, মুখে হাতে জল দিয়া, অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন।

সেই বৈঠকখানা ঘরে আর কেহ নাই। এই সুযোগেই কথাবার্ত্তা গুলো শেষ করিয়া লওয়াই সুবিধা, এই ভাবিয়া প্রসন্নকুমার গোপালগোবিন্দকে বলিলেন—"তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কর্ম্মের সময় তুমি না আসাতে আমরা বড়ই দুঃখিত। তবে কি কারণে যে তুমি আসিতে পার নাই, তাহাও আমরা শুনিয়াছি। যাহা হ'ক, আমার ২৭এ তারিখের খুব বড় পত্রখানা তুমি যে পাইয়াছ তাহার কোন সন্দেহ নাই। কেননা তুমি তার জবাব দিয়াছ।

এখন এ বৈঠকখানায় কেউ নাই। আছি তুমি আর আমি। এই সময়ে আমাদের কথাবার্ত্তা গুলি শেষ করিয়া লওয়া উচিত।"

গোপাল নম্রভাবে বলিল—"আমি আর বাড়ীর সম্বন্ধে কি বলিব! আপনি যা কিছু বলবেন, তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত।"

প্রসন্নকুমার। তুমি যদি এ গ্রামে আসিয়া বাস কর, তাহা হইলে তোমার দেশের বিষয় সম্পত্তি দেখিবে কে?

গোপাল। আমার আর এক কনিষ্ঠ সহোদর আছে।

প্রসন্ন। হাঁ—হাঁ—ও কথাটা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তা তোমরা দুই সহোদর কি এক অন্নে আছ?

গোপাল। আজ্ঞে হাঁ। আর সে আমার বড় অনুগত।

প্রসন্ন। তা বেশই হয়েছে। আমি আমার নিজের স্বার্থের জন্য যে বলছি তা নয়। আমার নিজের স্বার্থ আর কিছুই নয়, যাহাতে মাতৃহীনা কমলা একটু সুখে থাকে। আর এটা কেবল কমলা বা আমার একাইক স্বার্থ নয়, এতে তোমারও বৈষয়িক স্বার্থ যথেষ্ট। এই বাজারে চেষ্টা না করেও একটা পাঁচহাজার টাকার সম্পত্তি লাভ বড় সহজ কথা নয়। তা তুমি যদি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও, যে এখানে এসে, কমলাকে নিয়ে ঐ ভিটেয় ঘরকন্না করবে, তাহলে আমি বাড়ীখানা না হয়, নিজের খরচায় মেরামত করিয়ে দিই। অবশ্য এ টাকাটা আমাকে আমার নিজের গাঁট থেকেই দিতে হবে। আমার কথাটা বেশ ভাল করে বুঝে নাও গোপাল! তার পর কাল না হয় বিবেচনা করে, এর একটা জবাব তুমি দিও। আর একথা আমি অবশ্য তোমাকে বলছি না, যে আর যে দু'জনকে তুমি নারায়ণ সাক্ষী

করে বিবাহ করেছো—তাদের ভাসিয়ে দাও। তারা যদি এখানে এসে তিন জনে মিলে মিশে ঘর কন্না করে, তাহাতে আমি বা আমার ভাইঝি কমলা, একটুও অসন্তুষ্ট হবে না।

গোপালগোবিন্দ প্রসন্নকুমারের এই সহজ ও সরল কথায় তাঁহার প্রতি বড়ই শ্রদ্ধাবান হইল। সে মনে মনে তাঁহার খুল্ল-শ্বশুরের চিত্তের এই অমানুষিক উদারতার জন্য, ধন্যবাদ দিয়া বলিল—"কাকাবাবু! আমি জানি, আপনার মত উদারপ্রাণ পরদুঃখকাতর, পরোপকারী লোক, খুব কমই আছেন। আপনি যা বলছেন, আজ রাত্রিটা আমায় একবার ভেবে দেখ্‌তে দিন। কাল সকালে, আমি এর জবাব দোব।"

ইহার পর প্রসন্নকুমার, গোপালগোবিন্দকে লইয়া, অন্তঃপুরে গেলেন। অপর্ণার চেষ্টায় ও ব্যবস্থায়, তাঁহার আদর যত্নের কোন অভাবই হইল না। বিন্দুবাসিনীর কাছে তিনি যেভাবে আদর যত্ন পাইতেন, অপর্ণা তার চেয়ে তাঁহাকে খুব বেশী যত্ন করিল।

অপর্ণা তাহার কক্ষের পার্শ্বের একটী ঘর, কমলাদের রাত্রি যাপনের জন্য, ঠিক করিয়া দিয়াছিল। এই কক্ষে, ইতিপূর্ব্বে অপর্ণার স্বর্গগত জননীদেবী থাকিতেন।

বলাবাহুল্য, সুন্দর একখানি কাপড় পরাইয়া, দুই চারিখানি অলঙ্কারে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া, তাহার চুলটী বাঁধিয়া, ঠিক যেন বাসরঘরের কনে বৌটী সাজাইয়া, অপর্ণা যথা-সময়ে তাহার ভগ্নিকে, ভগ্নিপতির শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিল।

গোপালগোবিন্দ, আহারান্তে তামাকু সেবন করিতেছিলেন।

তিনি সুবেশপরিহিতা কমলাকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, খুবই একটা তীব্র আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। কমলার রূপের উজ্জ্বল ছবিখানা, তাহার বুকের ষোলআনা স্থানই দখল করিয়া ফেলিল।

কমলা-গললগ্নীকৃতবাসে ভক্তিভরে, স্বামীচরণে প্রণাম করিল। এটা অপর্ণার সুশিক্ষার ফল। ধরিতে গেলে বর্ত্তমানকালে এ প্রথাটা ক্রমে ক্রমে, যেন বঙ্গ সংসার হইতে উঠিয়া যাইতেছে।

কমলার হাত ধরিয়া তুলিয়া, গোপাল তাহাকে শয্যার উপর তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া, সহাস্যমুখে বলিলেন—"কেমন আছ তুমি কমলা?"

কমলা। মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন, এ অবস্থায় আমার যেমন থাকা উচিত, সেই রূপই আমি আছি। ভাগ্যে অপর্ণারূপে, এক দেবী—এ ধরায় এসেছিলেন, তাই বেঁচে গেলুম। একটা মহৎ আশ্রয় পেয়েছি। তুমি ত আর চরণে স্থান দিলে না। কতদিন পরে আজ এখানে এসেছ বল দেখি!"

এই কথাগুলি বলিবার পর, কমলার ইন্দীবরতুল্য, আয়তলোচন দুটী, অশ্রুভারাবনত হইল। গোপালগোবিন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়া কমলাকে বলিলেন—"দেখ কমলা! ভগবান যতদিন না মানুষকে সুখের অবস্থা আনিয়া দেন, ততদিন তাহাকে দুঃখের যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হয়। এই দুঃখের দিনে, সহস্র চেষ্টা করিলেও, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। কেননা বিধিলিপি খণ্ডনের সাধ্য, কাহারও নাই। কমলা! এতদিন তোমার আর আমার দুঃখের দিনই ছিল। বোধ হয়, নারায়ণ এইবার আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।"

কমলা কথাটা করে পরিয়ে দিয়েছে। সে যে মার চেয়েও পরে এ কথাটা কিসে বুঝিবে.

গোপাল। আজ প্রসন্ন কাকা—"তোমার অপিদিদির সঙ্গে ত শেষ হইয়া গিয়াছে।

কমলা। কিসের কথাবার্ত্তা?

গোপাল। তোমার মাতার অন্তিমের ইচ্ছা এই, তাঁহার দেহান্তের পর, তোমাদের ভিটায় বাস করিয়া, তোমা লইয়া ঘরকন্না করিব। তা আমি বোধ হয়, দুই মাসেব মধ্যে এ গ্রামে বাস উঠাইয়া আনিতেছি। খুব সম্ভবতঃ—তার আগেও আসিতে পারি। আর ঘর দোরগুলি, যদি একমাসের মধ্যে মেরামত শেষ হইয়া যায়, তাহাহইলে খুব শীঘ্রই আমি কুঁদপুরে আসিয়া বসবাস করিব।

এই কথা বলিয়া, গোপালগোবিন্দ তাঁহার সহিত অপর্ণার পিতার যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার সবই খুলিয়া বলিলেন।

কমলা বলিল—"তা বেশ কথা! কিন্তু আমার ত স্বামীর ভিটায়, একদিনও বাস করা হইল না। মা বলিতেন—স্বামীর ভিটা, স্ত্রীলোকের পক্ষে কাশী-কাঞ্চীর চেয়েও বেশী পবিত্র তীর্থস্থান।

গোপাল। তা সত্য কথা। তুমি যদি আমাদের ওখানে যেতে চাও, আমি তোমাকে শীঘ্রই না হয় নিয়ে যাব। সেখানে তুমি মাসখানেক সেখানে থাকবে। তারপর যখন এখানে উঠে আসা হবে, তখন আবার আমার সঙ্গে আসবে।

কমলা, এ কথায় বড়ই আনন্দিতা হইল। বহুদিন হইতেই

করাও আমার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণের ক্ষমতাসাধ্য নয়। আমার নিজের ভিটের চালাঘর কয়খানা সারাতেই, আমি নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি। তা কোটা বাড়ীতো দূরের কথা। শুনে আশ্চর্য্য হবে তোমার রাঙ্গাকাকা, এই বাড়ী মেরামতের জন্য, আমায় পাঁচশো টাকা দান করতে স্বীকৃত হয়েছেন।”

কমলার হৃদয়, তাহার রাঙ্গাকাকার হৃদয়ের এই মহত্ত্বে যেন দশ হাত ফুলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এই দয়াবান প্রসন্নকুমার যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে এই উত্তালতরঙ্গময় সংসার সমুদ্রে, সে ক্ষুদ্র তৃণ খণ্ডের মত ভাসিয়া যাইত।

যাই হোক্, সেই সুখময় রজনীতে, একটা নূতনতর আনন্দে বিভোর হইয়া, স্বামীসমাগমাশাপ্রত্যাশিতা বিরহিণী কমলা, তাহার জীবনাধিকের সহিত অনেক সুখ দুঃখের কথা কহিল। তাহার একটুকুও ভয় হইল না, যে তাহার অপিদিদি যদি আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথাগুলি শুনিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি হইবে ?

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, গোপালগোবিন্দ কমলাকে বলিলেন— “তোমাকে তোমার শ্বশুরের ভিটায় একবার বাস করাইতে আমি বড়ই উৎসুক। এখান হইতে চলিয়া গিয়াই, আমি তাহার সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিব। নিজে যদি একান্ত না আসিতে পারি, আমাদের বাড়ীর পুরাতন চাকর বৃদ্ধ রামচরণকে তুমি জানতো। তোমায় লইয়া যাইবার জন্য, সেই রামচরণকে পাঠাইয়া দিব। আর এ সম্বন্ধে তোমার রাঙ্গাকাকাকেও আজ অনুরোধ করিয়া যাইতেছি। নিঃসঙ্কোচ চিত্তে, তুমি এই রামচরণের সঙ্গে যাইও।”

সুখের রজনী হউক, আর দুঃখেরই হউক, তাহা কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কমলার বড় সাধের সুখের সর্ব্বরী, কাজেই এই সনাতন নিয়মাধীন হইয়া, নানাবিধ সুখ-দুঃখের কথায় কাটিয়া গেল।

(২৪)

পাপের জননী হইতেছে কুচিন্তা। পাপ—মানুষের সঙ্গেই থাকে। আর কুচিন্তা, তাহার পরিপুষ্টি সাধন করে। আর সেই চিন্তানুসারী কার্য্য পাপের খোরাক জোগায়।

কমলা অবশ্য এই রামপ্রসাদের শোণিত-সম্পর্কীয় কেহই নহে। কমলার মত রূপসীও, প্রসাদ আর কখনও চোখে দেখে নাই। সত্য বটে, সে আগে বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে কমলাকে তাহার ভগ্নিপতির বাড়ীতে আসা যাওয়া করিতে দুই চারিবার দেখিয়াছিল। আর তাহাদের সহিত আত্মীয়তার হিসাবে, দুই চারিটি কথা বার্ত্তাও কহিত। কিন্তু তখন তাহার মনে কমলাকে দেখিয়া কোন কুচিন্তার উদয় হয় নাই, সুতরাং কোনরূপ পাপও ছিল না। কিন্তু কে জানে, এখন কি দুর্দ্দৈববশে, সে কমলার রূপের বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়িল।

রামপ্রসাদ তখন কমলার কক্ষ হইতে চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু সে দেখিল, তাহার হৃদয়ের অতি নিভৃতকন্দরে, কমলার রূপের ছবি প্রতিফলিত হইয়া গিয়াছে। তাহার মগজটা যেন একাবারে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। সে যে দিকে চাহে, সেই দিকেই যেন

কমলার সমুজ্জ্বল কান্তিভরা অপ্সরীমূর্ত্তি দেখিতে পায়। চোখ বুজিলে, চোখ চাহিলে, সে দেখিতে পায় কমলা তাহার সুমুখে দাঁড়াইয়া।

নিজের নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে বসিয়া, এই কমলার কথাই সে ভাবিতে লাগিল। যত ভাবে, হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী কমলার সেই ছায়াময় ছবিখানা, আরও যেন নূতনবর্ণে ফুটিয়া উঠে। কি সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের রাশি। কি সুন্দর আয়তলোচন, গণ্ডদেশে পড়ন্ত রৌদ্রের আভা পড়িয়া তাহা আরও যেন লাল হইয়াছে। তাম্বূল রাগরঞ্জিত, বান্ধুলিকুসুমকান্তিবিজয়ী ফুল্লাধরে, কি যেন একটা অপূর্ব্বমাধুরীমাখা হাসি ফুটিয়া আছে।

রামপ্রসাদের মনে একটা প্রবল আগ্রহ জাগিয়া উঠিল, যে সে পুনরায় একটা কোন অছিলা করিয়া, অপর্ণার কক্ষে গিয়া, কমলার সহিত দুটো কথা কহিয়া আসে। কিন্তু সে তাহা করিতে সাহস করিল না। কারণ—অপর্ণাকে সে বড়ই ভয় করে। অপর্ণার মত অমন রাশভারি স্ত্রীলোক, সে খুব কমই দেখিয়াছে।

কমলাকে পুনরায় দেখিবার একটা আগ্রহ চালিত হইয়া, রামপ্রসাদ একবার বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভাগ্য চকিতের জন্য প্রসন্ন হইল।

কেননা, রুদ্র পিসিকে কমলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"আর এক দিন এসো পিসিমা! তোমার সঙ্গে দুটো কথা কহিতে, আমাদের খুব আনন্দ বোধ হয়!"

কি মধুর কণ্ঠস্বর! কে যেন বাসন্তীনিশীথে ভৈরবী রাগিণীতে বীণা বাজাইতেছে। কোথায় লাগে পিকের পঞ্চম?

রামপ্রসাদের শয়তানী বুদ্ধিভরা মস্তিষ্কে, তথনই একটা নূতন মতলব জাগিয়া উঠিল। রুদ্রপিসি বাটির বাহির হইয়া গেলে—সে খুব বাবুয়ানা সাজে, বেশভূষা করিল। সযত্নে টেরি কাটিয়া, একটী আদ্ধির চুড়ীদারআস্তিন জামা গায়ে দিয়া প্রসাদ ফিটবাবু সাজিল।

তারপর—অতি সন্তর্পণে, তাহার পোর্টকাটী খুলিয়া, সেই ব্যাগের তলদেশে চতুরতার সহিত লুক্কায়িত, পূর্ব্বোক্ত নোটের তাড়া হইতে দশখানি নোট বাহির করিয়া লইয়া, তাহা তাহার জামার বুকের জেবের মধ্যে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিল। তারপর ছড়িগাছটী হাতে করিয়া, সে পাড়া বেড়াইতে বাহির হইল।

সেই দিন প্রাতে, প্রসন্নকুমার প্রসাদকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"এখানে অলস ভাবে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, তুমি কাল প্রাতেই মফঃস্বলে চলিয়া যাইতে চাও। আর ও পাঁচশত টাকা না হইলে, সমমাহী-কিস্তি যোগান দিতে পারিব না। পূজোর ভাবনা এখন ততটা ভাবিনা বটে, কারণ, পূজার এখনও একমাস দেরী। এটা জানিও—জমীদারের মফঃস্বলের গোমস্তারা আদতে খাঁটি লোক নয়। তুমি আমার অতি নিকট আত্মীয়, তাই এই সেরেস্তার কর্ম্মচারী হইলেও আমি তোমাকে খুব বিশ্বাস করি। সেখানে তুমি উপস্থিত থাকিলে, কেহ আদায়ের কাজে কোনরূপ গাফিলি করিতে পারিবে না। কিম্বা বাজে আদায় করিয়া প্রজাদের উত্যক্ত করিতেও পারিবে না। অতএব কাল সকালে তোমার এখান হইতে যাওয়াই চাই।"

রামপ্রসাদের মারফৎ এই পাঁচশত টাকা পাইয়া প্রসন্নকুমার

তাহার উপর আগে নারাজ থাকিলেও, এখন যেন একটু সদয় হইয়া ছিলেন। কেননা রামপ্রসাদ বলিয়াছিল—"মফঃস্বলে গিয়া এক সপ্তাহ পরে আপনাকে আরও পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিব।" আর কেন যে সে একথা বলিয়াছিল, তাহাও পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন। না পারিয়া থাকেন—তাহার ব্যাগের মধ্যে লুক্কায়িত বক্রী পাঁচশত টাকার নোটের কথাটা, একবার স্মরণ করিয়া লউন।

যৌবন, ধনসম্পত্তি আর অবিবেকতা; তিনই রামপ্রসাদের জুটিয়াছে। সুতরাং সে—কমলার ব্যাপারে কিছুতেই চিত্তদমন করিতে পারিল না।

ছড়ী গাছটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে, সে রুদ্রপিসির কুটীরের দিকে চিন্তাপূর্ণ মনে চলিল। সে একথা জানিত না, যে পিসির সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার মার একটা ঝগড়াঝাঁটি ও মন কসাকসি হইয়া গিয়াছে। পিসি মা এর আগে প্রসন্নকুমারের বাটীতে আসিলে—রামপ্রসাদের সহিত দুই চারিটা কথাবার্ত্তা কহিতেন, কিন্তু সেদিন তিনি তাহাদের ঘরের দিকে একবারও আসিলেন না, কিম্বা তাহার মা ও ভগ্নির সহিত, একটা কথাবার্ত্তা কহিলেন না। রামপ্রসাদ কিন্তু ইহার কোন কিছু কারণ বুঝিতে পারিল না।

প্রসাদ, খানিকক্ষণ প্রসন্নকুমারের প্রতিষ্ঠিত, শিবালয় সন্নিহিত বাঁধা ঘাটে বসিয়া—কমলার চিন্তায় কতকটা সময় কাটাইয়া, কখনও বা পাড়ায় দুইএকটী লোকের সহিত দুইচারিটা কথাবার্ত্তা কহিয়া, যখন দেখিল, তাহার পথ পরিষ্কার, তখন সেই সন্ধ্যায় অন্ধকারে

শরীর ঢাকিয়া, পিসিমার দ্বারে গিয়া ডাকিল—"ও পিসিমা! ও রুদ্রপিসি! দোরটা একবার খুলে দাও। আমি এসেছি গো।"

পিসি তখন একটা নারিকেল ভাঙ্গিয়া, চারিটি চালভাজা ও গুড় লইয়া, নৈশভোজের ব্যবস্থা করিতেছিলেন—এমন সময়ে প্রসাদের গলার আওয়াজ পাইয়া, তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তবুও ন্যাকা সাজিয়া, ভিতর হইতে বলিলেন—"কে ডাকে গা?"

প্রসাদ বলিল—"চিন্‌তে পাচ্ছো না পিসিমা! আমি রামপ্রসাদ। জমীদার প্রসন্নবাবুর বড়কুটম্ব।"

পিসিমা, তাঁহার উর্ব্বর মগজটী উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না, এই সন্ধ্যার সময় রামপ্রসাদ সহসা তাহার দ্বারস্থ হইল কেন? বিশেষতঃ যখন তার মার সঙ্গে, তার মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত নাই।

পিসিমা,—প্রসাদের সহসা আবির্ভাবের কারণ নির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ হইয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন—"এস প্রসাদ বাবু! এতদিন পরে কি ভেবে এই দীন দুঃখিনী পিসিমাকে মনে পড়ছে বাবা?"

রামপ্রসাদ, সন্তর্পণে দ্বারটী ভেজাইয়া দিয়া বলিল—"চল—দাওয়ায় গিয়ে বসিগে পিসিমা! তোমার সঙ্গে খুব একটা কাজের কথা আছে।"

রামপ্রসাদের কথায় পিসিমার বিস্ময়টা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্য হইতে, একটী মাদুর বাহির করিয়া, তাহা দাওয়ায় বিছাইয়া দিয়া, রামপ্রসাদকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

রামপ্রসাদ জুতা খুলিয়া, মাতুরের উপর বসিয়া, পিসিমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ কর পিসিমা! আমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক!"

পিসিমা ঠাকুরাণী, রামপ্রসাদের এই অপূর্ব্ব ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া, একটু বিস্মিত হইলেন। অতি ভক্তি যে ভাল নয়, আর তাহা চোরের লক্ষণ, ইহা ভাবিয়া পিসিমা বলিলেন—"তুমি যখন পেসন্নর সম্বন্ধি, আর আমাদের বিরুর ভাই—তখন আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বই আমি আর কিছু নই। তা আশীর্ব্বাদ করি, প্রসাদবাবু! তোমার লক্ষ্মীলাভ হোক।"

রামপ্রসাদ পিসিমার চিত্তুষ্টির জন্য বলিল—"তা তোমার আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই ফল্‌বে পিসিমা! তুমি নিষ্ঠে বামনের মেয়ে। আর তোমার মত পরোপকারী বিধবা, এ পাড়ায় দ্বিতীয় নেই। তা আজকাল তোমার চল্‌ছে কেমন?"

পিসি বলিল—"ভগবান যেমন চালিয়ে দিচ্ছেন, তেমনি চলে যাচ্ছে। একটা পেট্, তার জন্য আর ভাবনা কি? তা তুমি কাজকর্ম্ম বেশ মন দিয়ে কচ্ছো ত? পেসন্নর কাছে, আমি প্রায়ই তোমার সুখ্যেত করে থাকি। বলি—পেসাদবাবু আমাদের বড় হিসেবী লোক। তা জমীদারীর নায়েবী কাজে, বেশ দুপয়সা উপরি পাওনা আছে। সেটা জানত? তাতে লোকের আবস্তা ফিরে যায়। যা পাবে নষ্ট করোনা—জমিয়ে রেখো। এর পর তোমার বে হবে, ছেলে পুলে হবে। এখন কিছু ভাঁড়ে না ফেলে রাখ্‌লে, পরে চল্‌বে কি ক'রে।"

প্রসাদ একগাল হাসিয়া বলিল—"এ জগতে তোমার মত শুভাকাঙ্ক্ষী আর দুই এক জন যদি আমার থাকতো পিসিমা, তাহলে আমি ভাগ্যি ফিরিয়ে নিতুম।"

এই সময়ে এক মার্জ্জারী জানালার উপর বসিয়া, পিসিমার রাত্রের আহার্য্য সেই চালভাজা ও একবাটী দুধের উপর লোলুপদৃষ্টি করিতেছিল। পিসিমা জানিতেন, এই মার্জ্জারপ্রবর তাঁহারই অন্নে চিরদিন লালিতপালিত কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—বড়ই বিশ্বাস-ঘাতক। এজন্য তিনি প্রসাদকে বলিলেন—"একটু বসো তুমি। আমি এলুম বলে।"

পিসিমা ঘরের ভিতরে গিয়া চালভাজার ধামিটী ঢাকা দিয়া দুধের বাটীতে একখানি রেকাবী চাপা দিয়া রাখিয়া আসিয়া, দাওয়ার উপর জাঁকিয়া বসিয়া বলিলেন—"হা—এত দিন নয় ততদিন—কি মনেকরে এসেছ বাবা প্রসাদ!"

প্রসাদ তাহার পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া পিসিমার হাতে দিয়া বলিল—"তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, এই টাকাটী—আমার চাকরি হওয়ার জন্য, তোমায় সন্দেশ খেতে দিলুম।"

বিরজার মার উপর পিসিমা বড়ই নারাজ ছিলেন। অমন মার গর্ভে—এমন ছেলে জন্মায়, ইহা ভাবিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার একটা ধারণা জন্মিল—বিরু আর তার মা দুজনেই মহাকঞ্জুস। দুটী ভাজামুগের দাল এই প্রসাদের মার কাছে চাইতে গিয়েছিলেন তিনি। তাতে সে তাকে দশ কথা

শুনিয়ে দিয়েছিল। আর এই প্রসাদ, তার চাকরী হয়েছে বলে বাড়ী বয়ে তাঁকে একটী টাকা সন্দেশ খেতে দিতে এসেছে। কাজেই পিসিমার মনটা, প্রসাদের গুণাবলীর একটু পক্ষপাতী হইয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন—"তা প্রসাদবাবু! টাকা আমি চাইনি। তোমার বলাতেই আমার যথেষ্ট হয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বাড় বাড়ন্ত হোক।"

পিসিমাও টাকাটী লইবেন না, প্রসাদও ছাড়িবে না। খুব জেদাজেদী করিয়া প্রসাদ সেই টাকাটী পিসিমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া তবে ছাড়িল।

পিসিমা, বলিলেন—"দুখানা বাতাসা গালে দিয়ে, একটু জল খাওনা বাবা! মনে ভাব্‌বে, যে পিসি তোমার আদর যত্ন কল্লে না।"

প্রসাদ। ও সব এখন আদর যত্ন করা এখন থাক। একটা কাজের কথা শোন আগে!

পিসি একথা শুনিয়া, একটু বেশী মাত্রায় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন—"কি কাজের কথা বল দেখি?

প্রসাদ। কাজ আমার মত গরীব লোকের নয় পিসি। খুব এক বড় জমীদারের। যদি কর, তা হলে ফাঁকতালে একশো থানেক টাকা পেয়ে যাও।

পিসিমা। কাজটা কি আগে শুনি। তারপর টাকার কথা বুঝবো।

প্রসাদ। আমি চিরদিনই জানি পিসি! পরোপকার করা তোমার স্বভাব। বেচারির অগাধ পয়সা। তবে সে এখন একটা দায়ে পড়েছে। আমার বন্ধুলোক সে। কাজেই আমাকে ধরে বসেছে তার দায়টা উদ্ধার করে দেবার জন্য।

পিসিমার চির সতেজ বুদ্ধিটি, প্রসাদের এই সমস্যাপূর্ণ কথার গোলকধাঁদার মধ্যে পড়িয়া, যেন কেমনতর হইয়া গেল। পিসিমা বলিলেন—"তোমার এই জমীদারটা কে একবার শুনি?"

প্রসাদ। তার নাম অনঙ্গবাবু।

পিসি। কই এমন নামের কোন জমীদার ত আমাদের এ অঞ্চলে নেই। তা তিনি কি চান?

প্রসাদ। ঐ যে রমানাথ চাটুজ্জের মেয়ে কমলা, যে এখন আমাদের বাড়ীতে আছে, যার ত্রিকুলে কেউ নেই, তাকে সে কোন রকমে দেখে পাগলের মত হয়েছে। সে ঐ কমলাকে চায়।

রুদ্রপিসি কথাটা শুনিবামাত্র, ভয়ে চমকিয়া উঠিল। মনে মনে বড়ই রাগত হইল। সে কুন্দুলে, পরশ্রীকাতর, পরনিন্দুক বটে, কিন্তু এরূব দূতীগিরির কাজ তাঁহাব দ্বারা কখনও হয় নাই।

পিসিমা এজন্য একটু বিরক্তির সহিত বলিল—"দেখ প্রসাদ-বাবু! এখানে আর কেউ নেই। আছি কেবল তুমি আর আমি। আর আমাদের মাথার উপরেই আকাশে সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান। সাবধান—যা বল্লে তা আর বলোনা। হতে পারে। আমি গরীব, আশ্রয়হীনা বিধবা। তা হলেও তোমার একথা আমাকে ব'লবার যে কোন অধিকার আছে—তা আমি স্বীকার কর্‌তে পারি না।"

পিসিমার কথায়, প্রসাদ একটু ঘাবড়াইয়া গেল। সে বলিল—"রাগ কর কেন পিসিমা! তার মাথার উপর ত কেউ নেই। একটা মা ছিল—সেও মরে গেছে। স্বামী—তা থেকেও নেই। ধ্বংসতে গেলে ওর জীবনটা বয়ে যাচ্ছে। এখন একটা বড়লোকের হাতে পড়লে, সুখে থাকবে এজন্য একথা বলছি। লোকটা আমায় বড্ড ধরেছে। আর কাজটা কর্ত্তে পাল্লে, মাঝখান থেকে তোমার আর আমার কিছু মোটা রকমের লাভ হয়ে যায়। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে কি পিসি? এই নাও তুমি—এখনি এক শো টাকার নোট।"

এই বলিয়া প্রসাদ, তাহার জামার পকেট হইতে পূর্ব্বকথিত দশ খানি নোট বাহির করিয়া, পিসিমার কাছে ধরিল। নোটের তাড়া দেখিয়া, পিসিমা বুঝিলেন—প্রসাদ তাহার সহিত বাজে ঠাট্টা করিতেছে না। বুঝিলেন, এই প্রসাদ অতি ভয়ানক লোক।

পিসিমা অবশ্য এরূপ ঘৃণিত কাজ, জীবনে কখন করেন নাই। কিন্তু নোটের তাড়াটা দেখিয়া, তাঁহার সুরটা একটু যেন নরমে নামিল। কেন—তাহা পিসিমাই বলিতে পারেন।

পিসিমা বলিলেন—"আমার কর্ত্তে হবে কি, সেটা আগে শুনি!"

প্রসাদ দেখিল, ধনুকের মত বাঁকা পিসিমা, নোটের তাড়া দেখিয়া চাঁচাছোলা বাঁখারির মত সরল হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে হর্ষ-পূর্ণ মুখে বলিল—"কর্ত্তে তোমার বেশী কিছু হবে না। তোমাকে এমন কাজের ভার দেব, যে কেউ তোমায় ধর্ত্তে ছুঁতে পারবে না পিসি! আমরা যে এ ব্যাপারের মধ্যে আছি, তাও কেউ জানবে না।

১৯৩

পিসিমা। তোমার অভিপ্রায়টা কি শুনি।

প্রসাদ। আমাদের সরকারী পুরাণো বাগানের পাশে একটা কালীতলা আছে। জানত সেখানে এই মাসের অমাবস্যায় একটা খুব বড় গোছের মেলা হয়ে থাকে। তুমি যদি ঐ কমলাকে কোন রকমে ফুস্‌লেফাস্‌লে সেই মেলারক্ষেত্রে একবার নিয়ে যেতে পার! বস্‌—তারপর যা করবার তা আমরাই কর্ব্বো!"

পিসিমা—নখ দিয়া মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিলেন—"কথায় শুন্‌তে সোজা হলেও, একাজটা করাব বুদ্ধি আমার নেই। বলা সহজ বটে—কিন্তু কাজে করা বড় শক্ত। জানতো জমীদার প্রসন্নকুমার একজন রাশ ভারি লোক। ভারি রাগী সে। এও জান ত আমি—তাঁরি জমীতে বাস করি। একথা কখনও যদি প্রকাশ হয়—আর হয় কি—নিশ্চয়ই হবে, তখন তোমার আর আমার প্রাণ বাঁচান ভার হবে।"

প্রসাদ। তুমি মন দিয়ে চেষ্টা কল্লে না হয় কি পিসি?

পিসিমা। না—সহস্র চেষ্টা কল্লেও তা হবে না। ঐ সতীসাধ্বী কমলাকে তুমি চেননা। বড় পবিত্র বংশে ওর জন্ম। হতে পারে ওরা গরীব। ওর স্বামী গরীব, কখনও খোঁজ খপর নেয় না। কিন্তু ওই কমলার জ্ঞান বুদ্ধি খুবই বেশী। ভারি ধর্ম্মপ্রাণা সে! আজকাল সে ব্রহ্মচারিণীর মত নিয়মপালন কচ্ছে। বাপ্‌রে! সে জলন্ত আগুণের কাছে এগোয় কে?

পিসিমাকে এইরূপ নিরাশ ভাবে কথা বলিতে দেখিয়া, রামপ্রসাদ মনে মনে একটা প্রমাদ গণিল। সে বলিল—"তাহলে আর কি হবে

রুদ্রপিসি বলিলেন—"চ'লে যেওনা তুমি প্রসাদবাবু! নোটগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যাও

১৯৫ পৃষ্ঠা।

পিসি! তবে তুমিও এ বিষয়টা খুব ভাল করে একবার ভেবে দেখ। নোট-গুলো তোমার কাছেই এখন না হয় থাক। তিনদিন আমি তোমাকে বিবেচনার সময় দিলুম। যদি এর মধ্যে কোন নূতন মতলব তোমার মাথায় আসে, তা আমাকে জানাতে পার।

প্রসাদকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া, রুদ্রপিসি বড় ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি বলিলেন—চলে যেও না তুমি প্রসাদ বাবু। নোট গুলি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

প্রসাদ আবার ফিরিয়া আসিল। তাহার প্রকৃতপক্ষে যাইবার ইচ্ছা একটুও ছিল না। সে কেবল পিসিমাকে পরীক্ষা করিতেছিল।

আর পিসিও যে তাহাকে ফিরিতে বলিলেন—তাহারও একটু কারণ আছে। এই রুদ্র পিসি অনেক বুদ্ধি লইয়া ঘর কন্না করেন। একটা সে দিনকার গণ্ডমূর্খ ছেলে, যে তাঁহাকে ঠকাইয়া যাইবে, তাহা তাঁহার বড়ই অসহ্য বোধ হইল।

সেই গ্রামের আশেপাশের দশকোশের মধ্যে, সকল গ্রামের জমীদারের নামই পিসিমা জানিতেন। কোন গ্রামে কার জমীদারী তাহাও তিনি যে না জানিতেন, তাহা নয়। কেননা সকল বিষয়ের একটা খুটিয়া সংবাদ সংগ্রহ করাই, তার প্রধান রোগ। আর এই জন্যই তিনি পল্লী-গেজেটরূপে কুঁদগাঁয়ে বিরাজ করিতেছিলেন। আশ পাশ দশক্রোশের মধ্যে, এই প্রসন্নবাবু আর কৃষ্ণকিশোর রায় চৌধুরী নামের আর একজন জমীদার ছাড়া, আর কাহারও জমীদারী নাই। এই অনঙ্গমোহন তাহা হইলে নিশ্চয় একটা কল্পিত নাম।

পিসিমা ভাবিলেন—"এজগতে এই প্রসাদের মত হারামজাদা শয়তান আমি খুব কমই দেখিয়াছি। এখন সব কথা মনে পড়িতেছে আমার। আমি যখন অপর্ণার ঘরে প্রবেশ করি, তখন এও সেই ঘরে ছিল। আমাকে দেখিয়াই, একটু বিরক্ত ভাবে, সে ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তাহাও আমি লক্ষ্য করিয়াছি। অনঙ্গমোহনের নামটা তোমার মিছে অছিলা। তুমি নিজেই কমলাব সর্ব্বনাশের জন্য, আমাকে এ ব্যাপারে জড়াইতে আসিয়াছ। কিন্তু তা তুমি পারিবে না চাঁদমণি। আজও এই পর্য্যন্ত রুদ্দুর-বামণীকে কেহ কখন ঠকাইতে পারে নাই। তা তুমি ত দুধের ছেলে বাপু!

পিসিমাকে এই ভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া, প্রসাদ ভাবিল এটা সুলক্ষণ। কেননা শাস্ত্রে আছে, বিলম্বেই কার্য্যসিদ্ধি! অতএব পিসিমাকে সহজেই হাতকরা যাইবে।

পিসিমাই প্রথমে মৌন ভঙ্গ করিলেন। তিনি প্রসাদের মুখের দিকে একটা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"প্রসাদ! নিশ্চয়ই তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার মনের কথা যে কি, তাহা ত এখনও বুঝতে পারলুম না। সত্য কথা বলায় ক্ষতি কি?

প্রসাদ পিসিমার একথায় চমকিত হইয়া উঠিল। সুবুদ্ধিমতী রুদ্রঠাকুরাণী, প্রসাদের সেই পরিবর্ত্তিত মুখভাব লক্ষ্য করিলেন।

প্রসাদ বলিল—"কিসের সম্বন্ধে মিথ্যা বলিতেছি পিসি!

রুদ্র ঠাকুরাণী। এই জমীদার অনঙ্গ-মোহনের সম্বন্ধে। এই গাঁয়ের দশকোশের আশেপাশের সবই খবর আমি রাখি। কোনটা কার জমীদারী, তাহাও আমি জানি। দশ—কোশ কেন বাপু!

বিশকোশের মধ্যেও অনঙ্গমোহন বলিয়া কোন জমীদার নেই নাই।

কথায় বলে—"যে যত চতুর—সে তত ফতুর। প্রসাদ যতই চতুর হউক না কেন—সে কাঁচা সাক্ষীর মত পিসিমার কড়া জেরায় হঠিয়া গেল। সে বলিল—"তোমার এত প্রখর বুদ্ধি বলিয়াই, আমি এই প্রেমের দায়ে, তোমারই শরণাপন্ন হইয়াছি। এইবার সত্য কথা বলিব পিসিমা। কথাটা হ'চ্ছে এই অনঙ্গমোহনটোহন সবই বাজে কথা। আমি নিজেই কমলার জন্য বড়ই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছি। তুমি যদি এই কমলাকে আমার হস্তগত না করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি বিষ খাইয়া মরিব। তোমার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে।

রুদ্র পিসি মনে মনে বলিলেন—"ব্রহ্মহত্যা না হউক, গো হত্যার পাতক যে আমার হইবে সেটা খুব ঠিক। প্রকাশ্যে বলিলেন—"ছিঃ! ও সব কথা বলিতে নাই। তুমি যে সত্য কথা বলিলে, ইহাতে আমি খুব সুখী হইলাম। কিন্তু প্রসাদ তোমার ফরমাসী কাজটা অতি ভয়ানক। এখন এই কমলার একমাত্র অভিভাবক হচ্ছেন, জমীদার প্রসন্নকুমার। ব্রাহ্মণের ঘরের নাচার বিধবা হইতেছি আমি। পাঁচ দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আমার দিন গুজরাণ হয়। মাঝ হইতে—তোমার এই কুসলানিতে পড়িয়া, আমার ভাত ভিক্ষা পর্য্যন্ত মারা যাবে। প্রসন্ন ভারী রাগী লোক। ব্রাহ্মণের বিধবা বলে তিনি আমায় একটুও খাতির করবেন না। মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গাঁয়ের বার করে দেবেন। আর না হয়—আমার ঘরে আগুণ লাগিয়ে দেবেন। প্রসন্ন না দেন, গাঁয়ের আর পাঁচজনে দেবে। টাকাটা

...ন আমার কাছে রেখে যাও। আমি সে 'আগুণের খাপরা, কমলার মনের ভাবগতিক আগে লক্ষ্য করে দেখি। কাল্ ত তুমি মফঃস্বলে যাবে। সাত দিন না হয় আমায় সময় দাও। অবশ্য তোমার টাকা আমি এখন রেখে দিচ্ছি। যদি সহজে একাজ কর্ত্তে পারি, তোমার টাকা নোব। না হয় তোমায় ফিরিয়ে দেব। কিন্তু এই একশো টাকায় এমন ভয়ানক কাজ হতে পারে না। পাঁচশোখানি টাকা সর্ব্বসমেত চাই। সব আটঘাট বেঁধে ত কাজ কর্ত্তে হবে। পারতো এগোও। না হ'লে সরে পড়।

রুদ্রপিসি, মনে একটা মতলব আঁটিয়াই, এই ভাবের কথাগুলি বলিয়াছিলেন। আর এই দীর্ঘ বক্তৃতাটি করিয়াছিলেন। তাহার কূট কৌশলোদ্ভাবিত মতলবটি যে কি, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

পিসিমা কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"প্রসাদ! ও সব ঝুঁকির কাজ একশো দুশোতে হবে না। একটা কথা ভেবে দেখনা কেন—যদি একাজ করে এ গাঁ থেকে আমাকে উঠেই যেতে হয়, তা হ'লে ঐ দুএকশোটাকায় আমার কতদিন চলবে বাপু! আমার মনের কথা শোন তবে। যা আমি কত্তে যাচ্ছি, তার চেয়ে আর ভয়ানক পাপ কাজ কিছুই নেই। ইহকাল পরকাল সবই তাতে নষ্ট হবে। তা তুমি যদি পাঁচশো খানি টাকা, আমাকে আগাম দিতে পার, তাহলে পরশু একবার এই সময়ে এসো। এত সকাল সকাল এসো না। একটু রাতকরে অর্থাৎ সাতটা আটটার সময় এসো। কারণ যদি কেউ তোমাকে আমার বাড়ীতে ঢুকতে দেখতে পায়, তা হলে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। সেদিন যদি এই পাঁচশোটাকা

আন্‌তে পার, তাহলে চাইকি আমি তোমাকে এই বাড়ীতেই কমলাকে এনে দেখাতে পারি। তার পর তুমি তার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়ে সব ঠিক করো। অমন সুন্দর চেহারা তোমার, তুমি যদি তাকে হাত কর্ত্তে না পার, তাহ'লে আমার দোষ কি! যদি বিন্দেদূতী হতেই হলো, তাহ'লে শ্রীরাধার সঙ্গে তোমায় দেখা করিয়ে দিয়েই আমি খালাস। তার পর, কেমন চতুর কৃষ্ণ তুমি তা আমি একবার বুঝে নেব। কিন্তু কাল আমার একশো টাকা চাই। তাহ'লে মোট হলো দুশো। আর বাকী তিনশো যে দিন রাত্রে আমি কমলাকে এখানে আস্‌বো, সেই দিন আমায় আগাম দিয়ে, তবে তার সঙ্গে দেখা কত্তে পাবে। না হলে আমি চেঁচিয়ে সব গোলমাল করে দোব।"

প্রসাদ বলিল—"তাই হবে। কালই আমি আস্‌বো। এই কথা বলিয়া সানন্দমনে সে রুদ্রপিসির পায়ের ধুলা লইয়া সেস্থান ত্যাগ করিল!

(২৫)

রুদ্রপিসি পাড়াকুঁদুলী হউন, আর পর নিন্দুকই হউন, ব্রাহ্মণের ঘরের বাল-বিধবা তিনি। সতীত্বের তেজ আর দর্প—তার খুবই ছিল। তাহার মহা শত্রুরা এপর্য্যন্ত অনেক বিষয়ে রুদ্রপিসির নিন্দাবাদ করিয়াছে, কিন্তু রুদ্রপিসি যে প্রগলভা, বা কোনরূপে নারীসম্মান বর্জ্জিতা, তাহা বলিতে তাহার অতি শত্রুতেও সাহস করে নাই!

এই সতীত্বগৌরবে গরবিনী, রুদ্রপিসি, সতীর সতীত্বের মূল্য যে

কি, আর তাহাকে বিপদমুখে রক্ষা করার যে কি অসীম পুণ্য, তাহা বুঝিতে পারিয়াই অন্য পথে গিয়া দাঁড়াইল।

পিসি, সেই একশত টাকার নোট তাহার বিছানার বালিশের নীচে রাখিয়া, রাত্রের জলখাবার আর সেই দুধটুকু শেষ করিল। তার পর নিত্য প্রথামত, ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করিয়া, শয্যাশ্রয় করিল।

শুইয়া শুইয়া রুদ্রপিসি ভাবিতে লাগিল "হতভাগার স্পর্দ্ধা ত কম নয়! নিষ্ঠে ব্রাহ্মণ রমানাথ চাটুয্যের মেয়ে হচ্ছে ঐ কমলা। অমনি তেজস্বী ব্রাহ্মণ এদেশে আর কেউ কখনও জন্মায় নি। পরের ভাল করেই তাঁর দিন কেটে গেছে। আমার তিনি কত উপকার করেছেন। আর আমিই তাঁর সর্ব্বনাশ করবো! তারপর ঐ কমলা আমায় পিসিমা বলতে অজ্ঞান। বাছা কখনও পাড়ায় কারুর বাড়ী বেড়াতে যায় না। গাঁয়ের ঝিউড়ী সে, তবু তার আধ হাত ঘোমটা। এমন সতীলক্ষ্মী যে আমি কিনা তার অনিষ্ট করবো! হতভাগা প্রসাদ মড়াটার ঘটে কি তিলমাত্র বুদ্ধি নেই গা? এত বড় বুকের পাটাও মানুষের হয়? সতীত্বের শ্বেতপদ্ম, হিন্দুরমণীর সতীত্বরত্ন যে কুবেরের ঐশ্বর্য্যের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— হতভাগাটা কি তাও বুঝে না!"

এই সময়ে বিরজার মার সেই ঠেকারের কথাগুলি পিসিমার মনে পড়িল। ঘটনাটা হইতেছে এই—একদিন রুদ্রপিসির চারিটী ভাজামুগের দালের খিচুড়ী খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি বড় মুখ করিয়া, বিরজার মার কাছে চারিটি ভাজা মুগের দাল চাহিয়া-

ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রার্থনার উত্তরে বিরজার মা বলিয়াছিল—"চাইতে হয়, আমার মেয়ের কাছে চাও গে বাছা। কতকগুলো লোক এখন নিঘিন্নে যে এইরূপ চেয়েচিন্তে খাওয়াই হ'চ্ছে তাদের স্বভাব। ছিঃ! ছিঃ! ওসব দেখলে আমাদের যেন ঘেন্না করে। মেয়ের সংসারে আশ্রিত অন্নছত্র খুলতে আসিনি।"

পিসি এই কথায় ভারি চটিয়া গিয়া, বিরজার মার মুখের উপর বলিয়াছিলেন—"দেখ পেসাদের মা! অথ ঠ্যাকার ভাল নয়। তোমার ত বাপের বাড়ি থেকে আনা এসব জিনিষ নয়। জিনিষ হচ্ছে আমার পেসন্নর। পেসন্ন আমায় পিসি বলে মান্য করে, যখন যা ভাল মন্দটা হয়, আমায় নিজেই পাঠিয়ে দেয়। তার জিনিস বলেই আমি চেয়েছিলুম। জামায়ের ভাত হজম করে দেখ্‌ছি, চক্ষুলজ্জাও সেই সঙ্গে সঙ্গে পেটে পুরেছ। তা তোমার যে এ রকম আক্কেল হবে আর আশ্চর্য্য কি?"

এই সব কথায় তখনই একটা মহা রণারণি বাধিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিরজা সেই সময়ে সেইক্ষেত্রে আসিয়া পড়ায়, বিবাদটা তখনকার মত সেইখানেই খতম হইয়া যায়।

এতদিনের পর এই ঝগড়ার ও অপমানের কথাগুলা, রুদ্র-পিসির প্রাণে আবার পূর্ণভাবে তেজসঞ্চয় করিয়া ফুটিয়া উঠিল। পিসি যদি সেই রাগের সময়ে, রামপ্রসাদকে সম্মুখে পাইতেন, আহা হইলে হয় তো চামুণ্ডার মত তাহার মুণ্ডটা চিবাইয়া খাইতেন।

সেদিন রাত্রে পিসিমা কিন্তু ভালরূপে ঘুমাইতে পারিলেন না। কি করিয়া রামপ্রসাদকে আরও প্রলুব্ধ করিয়া ফাঁদে ফেলিতে পার

যায়, পিসিমা এই ভাবনাতে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। শেষ একটা খুব ভাল মতলব, তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে দেখা দিল!

রাত্রি প্রভাত হইলে পিসি, তাহার ঘরদ্বার উঠান আঙ্গিনার কাজ কর্ম্মগুলি, একটু ভোরে উঠিয়াই সারিয়া লইলেন। তার পর তিনি রান্না চড়াইয়া দিলেন। সকাল সকাল চারিটী খাওয়া দাওয়ার পর,একটী মাদুর পাতিয়া নিত্য অভ্যাসমত একটু গড়াইয়া লইলেন।

অন্যদিন পিসিমা বেলা তিনটা পর্য্যন্ত একটু ঘুমাইয়া থাকেন। কিন্তু সেদিন আর তাহা করিলেন না। কেননা—সেদিন তাঁহাকে অপর্ণার সঙ্গে একবার দেখা করিতেই হইবে। এজন্য আহ্নিক ও খাওয়াদাওয়া বেলা এগারটার মধ্যেই তিনি সারিয়া লইয়াছেন।

পিসিমা, তখনই দ্বারে চাবি দিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বেই, সদানন্দ তেলীর বাড়ী। তাহার পার্শ্বে কমলাদের বাস্তু। তৎপরে কমলাদের পূর্ব্বকথিত খিড়কীর উদ্যান। পিসিমা, এই বাগান দিয়া একবারে প্রসন্নকুমারের অন্দর মহলে গিয়া অপর্ণার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

(২৬)

লোকে মনে যা ভাবে, অনেক সময়ে কাকতালীয়বৎ তাহা যেন ঠিক ঘটিয়া যায়। রুদ্রপিসির এ সময়ে প্রসন্নকুমারের বাটীতে যাওয়ার উদ্দেশ্য, একবার কেবল অপর্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে এই কথাগুলা একবার শুনাইয়া দেওয়া। অপর্ণা জানিলেই তাহার পিতা প্রসন্নবাবু জানিবেন। তাঁহার সে উদ্দেশ্য আজ সহজে সিদ্ধি হইল।

পিসিমা দেখিলেন—অপর্ণা ইষ্টপূজা সারিয়া, সবে মাত্র আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর কমলাও সে কক্ষে তখন অনুপস্থিত।

তবু পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন—"অপু—মা! কমলা কোথায়?"

অপর্ণা পিসিমার প্রশ্নের অবস্থা আর তাঁর মুখে একটা আগ্রহ-পূর্ণ ভাব দেখিয়া, একটু বিস্মিতভাবে বলিল—"কেন পিসিমা! কমলাকে খুঁজিতেছ কেন?"

পিসিমা। তাহাকে খুঁজিতেছি না! তবে জানিতে চাই সে এখন কোথায়? কারণ, তোমার সঙ্গে আমার একটা খুব গোপনীয় কথা আছে। সেটা তার শোনা উচিত নয়।

অপর্ণা পিসিমার কথার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, একটু ভয় পাইয়া বলিল—"সে উপরে রান্না বান্নার জোগাড়ে আছে। এখন তাহার এখানে আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই!"

পিসিমা তখন অপর্ণার কাছে মৃদু স্বরে, প্রসাদের সহিত তাহার পূর্ব্ব দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিয়া বলিলেন—"মা অপু! কমলার সমূহ বিপদ উপস্থিত! তাহাকে যদি কেহ এ সংকট ক্ষেত্রে বাঁচাইতে পারে, তাহা হইলে সে তুমি? আর না হয় তোমার পিতা প্রসন্নবাবু!"

অপর্ণা! সামান্য নারী আমি! আমার শক্তি কি পিসিমা! দেখিতেছি, বাবাকে এ সব না জানাইলে চলিবে না।

পিসি। অপু! তুমি যে সতীত্বের শ্বেতপদ্ম মা! সতীত্বের মূল্য তুমি এই বয়সে যতটা বুঝিতে পারিয়াছ, এ তল্লাটে এমন আর কয়জনে

বুঝিয়াছে মা? রাণী হইয়াও তুমি ভিখারিণীর মত জীবনের দিনগুলি কাটাইতেছ। এই কমলা তোমার বড়ই আদরের জিনিস। তুমিই না হয় তোমার বাপ্‌কে বল।

অপর্ণা, পিসিমার এ প্রশংসাবাদে, একটা আন্তরিক গর্ব্ব অনুভব করিয়া বলিল—"পিসিমা! এ সংসারের লোককে দেখ্‌ছি চেনা ভার! এই প্রসাদমামা—যাঁহার সম্মুখে আমরা নিঃসংকোচে, বাহির হইতাম, একটুও ভয়সংকোচ করিতাম না, তাঁর কিনা এই কাণ্ড! যে কমলা, সম্পর্কে তাঁহার কন্যাস্থানীয়া, তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা! হাঁ! ভগবান! হায়! তোমার সৃষ্ট মানুষ!"

পিসিমা অপর্ণার কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন—"মা! তুমি ভিন্ন কমলাকে এ সংকটে আর কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। একথা সকলের আগে তোমাকে জানাইলাম কেন তা জান? আমি এই ভয়ানক কথাটা প্রসন্নকে মুখোমুখি বলিতে পারিব না। এই হতভাগার মায়ের সহিত আমার একটা মনোবাদ আছে—আর প্রসন্নও তোমার মুখে সে ঝগড়ার কথা শুনিয়াছে। তারপর ছোট বৌ বিরজার ভয়ও যে একেবারে আমি করি না তা নয়। আমি বলি—একথাটা আমার মুখ দিয়া প্রসন্নকে না শুনাইয়া, তুমি শুনাইলেই ভাল হয়।"

অপর্ণা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"ভাল! তাহাই করিব। বাবা সন্ধ্যা আহ্নিক ও পূজা শেষ করিয়া, আমার ঘরেই নিত্য জল খাইতে আসেন। সেই সময়ে, কথাটা তাঁহাকে জানাইবার বেশ সুবিধা হইবে। এখনি তিনি এখানে আসিবেন। তা

এর ফলাফল কি হয়, তাহা জানাইবার জন্য, বাবাকেই না হয় আমি তোমার বাড়ীতে গোপনে পাঠাইয়া দিব। কারণ, এরূপ স্থলে তোমার এ বাড়ীতে ঘনঘন দেখা দেওয়াটা উচিত নহে। রামপ্রসাদ মামা—তোমায় সহসা দেখিয়া ফেলিতে পারে। তাহা হইলেই তাহার সন্দেহ হইবে। সে সাবধান হইয়া যাইবে। আমার মনের কথা এই, যে তাহাকে হাতে নাতে পাকড়াও করা। তা তোমার প্রসাদ বাবু তোমায় যে নোটগুলি দিয়াছেন, সেগুলি কোথায় পিসিমা?

পিসিমা। আমি সেগুলোও সঙ্গে এনেছি। তুমি এখন রেখে দাও। তার পর আমার কাছে আবার পাঠিয়ে দিও। পেসন্নকে বলো, সে যেন—তুপুর বেলা একবার লুকিয়ে আমার বাড়ীতে যায়।

পিসিমা চান, এই মহা তুষ্ট রামপ্রসাদকে একটু শিক্ষা দিতে। তিনি চান—বিরজার মার দর্প চূর্ণ করিতে। কি কৌশলে ইহা করিতে হইবে, তাহার মতলব বাহির করিবার ভার প্রসন্নর উপর অর্পণ করিয়া, আর সেই একশত টাকার নোটগুলি অপর্ণার হাতে দিয়া পিসিমা, অতি সন্তর্পণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

যথাসময়ে প্রসন্নকুমার পূজা আহ্নিক সারিয়া, নিত্য প্রথামত অপর্ণার কক্ষে জল খাইতে আসিলেন। মুখরা পত্নীর সহিত তাঁহার এদানীং খুব কম সম্পর্কই ছিল। অবশ্য আহারের সময়, তিনি বিরজার ঘরেই মধ্যাহ্ন কৃত্য করিতেন। কেননা, বিরজাই তাঁহার ভাতের থালা উপরে আনিয়া দিত। সেই সময়ে অপর্ণাও পিতার কাছে গিয়া বসিত। বিরজা, এই সময়ে স্বামীর সহিত তুই চারিটী

কথা কহিতেন। তিনিও উত্তরে হাঁ—না করিয়া জবাব দিয়া প্রতি-মাসে সংসার খরচের প্রয়োজনীয় টাকাগুলি তিনি বিরজাকে ফেলিয়া দিতেন। টাকা লইয়াই, এ সংসারে সকল রকম গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সংসারখরচের আর মাসিক হাতখরচের টাকাগুলি পাইয়া বিরজা এদানীং কিছু সঞ্চয় করিতেছিল। বিরজার জননী কন্যাকে গুরুমন্ত্র দিয়াছেন—যে মানুষের শরীর কখন কি হয় বলা যায় না। তা—আমার পেটে জন্মে নির্ব্বোধ হয়োনা মা! রোদ্দুর থাকতে, ভিজে কাপড় শুকিয়ে নাও।"

অপর্ণা পিতাকে জলখাবার সাজাইয়া দিল। প্রসন্নকুমার সেগুলি খাইবার পর, একটা পান মুখে দিয়া বাহিরের দপ্তরখানায় যাইতে উদ্যত—এমন সময়ে অপর্ণা মৃদুস্বরে বলিল—"যাইও না বাবা! একটা খুব কাজের কথা তোমার সঙ্গে আছে। কিন্তু একটু আস্তে আর ঠাণ্ডাভাবে কথাবার্ত্তা কহিও।"

অপর্ণার বিমর্ষ মুখ দেখিয়া, প্রসন্নকুমারের মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল, যে বিরজা হয়তঃ অপিকে কিছু রূঢ়কথা বলিয়াছে। এজন্য তিনি তটস্থ হইয়া বলিলেন—"ব্যাপার কি অপু?"

অপর্ণা তখন ধীরে ধীরে—পিসিমার আগমন, আর তাঁহার কথিত কমলাঘটিত সমস্ত-কাহিনী, পিতাকে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল।

প্রসন্নকুমার কথাটা শুনিয়া শুনিয়া কেবলমাত্র বলিলেন—"বটে! এ স্পর্দ্ধা সেই হতভাগার?"

অপর্ণা, পিতার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল—"রাগ করিও না

বাবা। তোমার রাগ হইলে এ সংসারে একটা খণ্ড প্রলয় উপস্থিত হইবে।"

প্রসন্নকুমার বলিলেন, এ কথায় রাগ হয় কিনা তুই বল দেখি মা। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। এই কমলি, যে তোর চেয়ে আমার বেশী আদরই যত্নের। মরবার সময় বৌদি যে এই কমলির সমস্ত ভার আমার হাতে দিয়া গিয়াছেন। তার উপর এই অত্যাচার?"

কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তার পর প্রসন্নকুমার বলিলেন—"অপু। তোর মার মৃত্যুর পর ঐ হতভাগিনীকে বিবাহ করিয়া আমি জ্বলিয়া মরিতেছি। সতীলক্ষ্মী মরিবার সময়, আমায় পুনঃপুন বলিয়া গিয়াছিল "আর সংসার করিও না তুমি। এ বয়সে বিবাহ করিলে খুব কম লোকই সুখী হয়।" তাহার কথা শুনি নাই—তার ফল যখন হাতে হাতে পাইতেছি। এত করিয়াও তার মন পাই নাই। দিনরাত কেবল বাক্য গঞ্জনা, কিচ্‌কিচি আর ঝগড়া বিবাদ। ঐ শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী আর তাঁর এই অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র, এবাড়ীতে আসার পর হইতে এসংসার যেন উহাদের, হইয়া গিয়াছে। তুই আর আমি যেন এ সংসারে চোরের মত হইয়া পড়িয়াছি। আমার সহ্যগুণ বড় বেশী, তাই আমি কোন কথা কহিনা। যাই হক এতদিন আমার নিজের উপর ঐসমস্ত অত্যাচার আমি মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু আর ত সহ্য হয় না অপর্ণা! যে কমলা আমার কন্যার মত, যে রমানাথ দাদার বুদ্ধি কৌশলে আজ আমি জমীদার প্রসন্নকুমার, যার স্ত্রী বিন্দু-

বাসিনীর নিকট হইতে আমি মায়ের যত্ন আদর পাইতাম—তার কন্যার উপর এই অত্যাচার। আমি আজই সকলের সম্মুখে এই হতভাগাটাকে পয়জার মারিয়া, বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিব।"

অপর্ণা পিতার হাতখানি ধরিয়া কোমলস্বরে বলিল—"না—না বাবা তা করিও না। তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিবে। কেলেঙ্কারি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। ব্যাপারটা আর একটু অগ্রসর হইতে দাও। শয়তানকে হাতে নাতে ধরিবার ব্যবস্থা কর। তাহা হইলে তাহাদের তিনজনের মুখেই চুণ কালি পড়িবে। উহারা আপনা হইতেই তোমার সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে তোমার বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না।"

অপর্ণা চিরদিনই বুদ্ধিমতী। অনেক সময়ে এই কন্যা রত্নের বুদ্ধি অনুসারে কাজ করিয়া, প্রসন্নকুমার অনেক জটিল ব্যাপারের সোজা পথ দেখিতে পাইয়াছেন। তার একটা উদাহরণ দিই।

একসময়ে পুরাতন নায়েবের অত্যাচারে, প্রজারা একজোটে ধর্ম্মঘট করিয়া জমীদারের খাজনা বন্ধ করে। সেই সময়ে সেই নায়েব মহাশয় প্রসন্নকুমারকে লিখিয়া পাঠান—"পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল না হইলে, প্রজা শাসন হইবে না।" অপর্ণার কাণে একথাটা যায়। সে পিতাকে পরামর্শ দেয়—"না—বাবা তা করিও না। এই প্রজাই হইতেছে—জমীদারের লক্ষ্মী। খালি তাই নয়। তারা জমীদারের সন্তান তুল্য। জমীদারের যা কিছু ঐশ্বর্য্য ধন সম্পদ, আর বাবুয়ানা, সবই এই প্রজার দৌলতে। সন্তান অবাধ্য হইলে, তাহাকে প্রহার

করিয়া শোধরাইতে গেলে, সে বড়ই বিগড়িয়া যায়। মিষ্ট কথায় বুঝাইলে কিন্তু এর চেয়ে বেশী ফল হয়। তোমার মফঃস্বলের কর্ম্মচারিরা নিশ্চয়ই ভাল লোক নয়। তুমি নিজে না হয় জমীদারী মহলে যাও। পঞ্চাশজন লাঠিয়াল পাঠাইয়া যে কাজ কখনই সম্ভবপব হইবে না, তাহা তোমার একটা মিষ্ট কথাতেই হইবে। আমার শ্বশুর এইভাবেই জমীদারী চালাইয়া থাকেন।” বলা বাহুল্য অপর্ণার এই যুক্তি অনুসারে কাজ করিয়া, প্রসন্নকুমার অতি সহজে সেই প্রজাবিদ্রোহ দমন করিয়া, প্রজাদের বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

কাজেই প্রসাদসম্বন্ধে অপর্ণার এই পরামর্শটা তাহার খুব ভাল লাগিল। তিনি বলিলেন—“তুই যা বলিয়াছিস্ অপি! সেই মতই কাজ করিব! এখন একটু ভাবিয়া দেখি গে কি ভাবে জালটা পাতিতে পারি। তারপব রুদ্রপিসির সঙ্গে মধ্যাহ্নে একবাব গোপনে দেখা করিয়া, সব ঠিক করিয়া ফেলিব।

(২৭)

নির্জ্জন বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া, নানাদিক দিয়া চিন্তার পর প্রসন্নকুমার কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, একেবারে একশত টাকা প্রসাদ পাইল কোথায়? আর সে যখন প্রকারান্তরে পিসিকে আরও চারিশত টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে, তখন তাহার হাতে নিশ্চয়ই অনেকগুলা টাকা আছে। ঠিক এই সময়েই ভবিতব্যের ফেরে, গোমস্তা নিবারণচন্দ্রের একখানি পত্র

মফঃস্বল হইতে ডাকে আসিল। সেই পত্র হইতে প্রসন্নকুমার সকল ঘটনাই নখদর্পণের মত বুঝিতে পারিলেন।

নিবারণের পত্রে প্রসাদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই লেখা ছিল। সে সব কথা আর কিছু নয়, প্রসাদের বাবুয়ানা আর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি সম্বন্ধে। তাহার মধ্যে যে কয়েকটা ছত্র আমাদের প্রয়োজন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

নিবারণ লিখিয়াছে—"সন্‌মাহী—কিস্তির জন্য আমিই অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া, এক হাজার টাকা আদায় করিয়াছি। প্রসাদবাবু কিছুই করেন নাই। তিনি কেবল দাখিলাতে সহী করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। তাঁহার রাত্রের ফুল্‌কো—লুচি মাছের—মুড়া, এক সের দুধের বৈকালিক জলখাবারের খরচ ও রসুয়ে বামুনের মাহিনা বাবত সরকারী তহবিল হইতে, প্রতি মাসে পাঁচশ ত্রিশ টাকা খরচ হইয়া যাইতেছে। এসব কথা আপনাকে একবার খুলিয়া বলা দরকার। তাহা না হইলে শেষ আমাকেই চোর হইতে হইবে। হুজুর ভাবিবেন—যে আমার সহিত যোগসাজোস করিয়া প্রসাদবাবু হয়তো এই সর্ব কাজ করিতেছেন। যাহা হউক, মামাবাবুর বরাবর এই এই হাজার টাকা চালান দিবার পর হইতে, আমি বড়ই ভাবিত রহিয়াছি। কারণ মামাবাবুর হাতটা বড় দরাজ। তিনি টাকাটা পুরাপুরি আপনাকে দিয়াছেন কিনা. সে সংবাদ পত্রপাঠ মাত্র এক-জন দরোয়ানকে পাঠাইয়া জানাইবেন। নচেৎ আমি সদরে গিয়া হুজুরকে জানাইতে বাধ্য হইব। আরও পাঁচশত টাকা আমি আদায় করিয়াছি। এই টাকা আপনার প্রেরিত উক্ত দরোয়ানের

মারফৎ পাঠাইব। আর দরোয়ান যদি না আসে, তাহাহইলে আমি নিজেই লইয়া যাইব। মামাবাবু পাঁচ ছয় দিন হইল, এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফিরিবার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। ভারপ্রাপ্ত নায়েব তিনি। তাঁহার সহীকরা দাখিলাগুলি ফুরাইয়া আসিয়াছে। নূতন দাখিলা না হইলে টাকা আদায় বন্ধ হইবে।

আর একটা ভয়ানক কথা, আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি। কিন্তু না জানাইলেও অন্য কোন উপায় নাই। আমাদের রাজা আপনি, জমীদার আপনি। আপনাকে না জানাইলে এর পর আমার উপর ঝুঁকি পড়িবে। প্রসাদবাবু আজকাল মদ ধরিয়াছেন। তার পর এক পিতৃমাতৃহীনা কৈবর্ত্তকন্যার সহিত, তাঁহার একটা খুব আত্মীয়তার ভাব জন্মিয়া গিয়াছে। শেষেরটা বন্ধ না করিলে ভবিষ্যতে একটা মহাকেলেঙ্কারি উপস্থিত হইতে পারে। প্রসাদ বাবু যদি আপনার নিকট আত্মীয় না হইতেন, তাহাহইলে আমি এরূপ ভয় পাইতাম না। কোন প্রজা হইলে তাহাকে দরোয়ানকে দিয়া কাছারী বাড়ীতে ধরিয়া আনাইয়া নিজেই শাসন করিতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কোন ক্ষমতাই নাই। হুজুর মালিক! হুজুরের কাছে এজন্য সকল কথা অকপটে খুলিয়া বলিলাম। আপনি এসময়ে একবার এখানে না আসিলে সবই ক্ষতি হইবে।" দাসানুদাস—শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ।

এই পত্র পাঠান্তে, প্রসন্নকুমার তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, এই প্রসাদকে বাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিয়া আনিয়া, নিবারণের চিঠিখানি তাহাকে শুনাইয়া

তাহার কাণ মলিয়া অপমান করিয়া, তাড়াইয়া দেন। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় তাঁহার বাড়ীতে একটা ভয়ানক কাণ্ড বাধিয়া যাইবে। প্রসাদজননী কন্যার সহিত মিলিয়া এক মহা সোরগোল উপস্থিত করিবেন। এই সব ভাবিয়া প্রসন্নকুমার তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হায়! কেন আমি পত্নীর কথায় শুনিয়া এই হতভাগাকে জমীদারীতে পাঠাইয়াছিলাম? তাহা হইলেত এ সব কেলেঙ্কারি হইত না। ইহার উপর কমলার এই সব কাণ্ড!"

কিন্তু অপর্ণা তাঁহাকে মাথাঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ করিতে বলিয়াছে, এজন্য প্রসন্নকুমার একটু চেষ্টা করিয়া চিত্ত দমন করিলেন। তারপর তিনি আহারাদি শেষ করিয়া, একটু বিশ্রামান্তে, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, খিড়কীর বাগানের মধ্য দিয়া, রুদ্রপিসির বাড়ীর পথ ধরিলেন।

অন্যদিন আহারান্তে রুদ্রপিসিও একটু নিদ্রা দেন, কিন্তু সেদিন তাহা করেন নাই। কেননা প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি, প্রসন্নকুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

প্রসন্নকুমার পিসিমার বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্রই, তিনি অতি সমাদরে ঘরের মধ্যে তাঁহাকে বসাইয়া একখানি পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে বলিলেন—"সব শুনেছে তো বাবা পেসন্ন! এখন উপায় করা যায় কি?"

প্রসন্নকুমার পিসিমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—"সার্থক জন্মেছিলে—তুমি পিসিমা। এই কথাটা আমাকে জানিয়ে কেবল

যে তুমি কমলার উপকার করেছে—তা নয়। এতে আমার সুনাম আর চাটুজ্জেদের সংসারের সম্ভ্রম রক্ষা হলো। এই কেলেঙ্কারিটা ঘটে গেলে এ গ্রামে জন্মের মত আমার মাথা নীচু হয়ে যেতো। তা—কথাটা যখন আমার কাণে এসেছে, তখন তার উপায়ও স্থির করে ফেলেছি। উপায়টা কি তোমায় সব বলে যাচ্ছি। ঠিক সেই রকম কাজ কল্লেই ইঁদুর কলে পড়বে।”

এই কথা বলিয়া, প্রসন্নকুমার তাহার মনের মতলব ও প্রসাদের ব্যাপারে ভবিষ্যতে করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে সমস্ত উপদেশ, রুদ্রপিসিকে বুঝাইয়া বলিলেন। কেননা সেই দিন সন্ধ্যার পর,প্রসাদের আসিবার কথা আছে। এজন্য প্রসন্নকুমার বলিলেন—“আজ তাহাকে আসিতে দাও। ও টাকা কোথায় পাইতেছে, তাহা আমি জানি। ও টাকা আমার জমীদারীর খাজনার টাকা। হতভাগা আমারই সর্ব্বনাশ করিয়া এই সব কাণ্ড করিতেছে। তুমি কৌশলে ঐ বাকী চারি শত টাকা হস্তগত করিয়া লইও। আজ তাহাকে বলিয়া দিও, সে যেন কাল সন্ধ্যার পর তোমার বাড়ীতে ঠিক রাত্রি আটটার পর আসে। আমি কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই, এই মাত্র যাহার কথা বলিলাম, তাহাকে তোমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিব। দেখিও পিসি! যেন শেষটা না বিগড়িয়া যায়। খুব সাবধান! সময় থাকিতে তাহাকে তোমার ঘরের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিও। প্রসাদ হতভাগাটা আসিবার আগেই, আমি আসিয়া যাইব।” এই কথা বলিয়া প্রসন্নকুমার রুদ্রপিসির বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন।

প্রসন্নকুমার যে ভাবে ফাঁদ পাতিবার সংকল্প করিয়াছিলেন,

তৎসম্বন্ধে সমস্ত খুলিয়া বলায়, পিসিমা বুঝিলেন—তাহা জমীদারের বুদ্ধির মত ব্যবস্থাই হইয়াছে। প্রসন্নকুমারের এই কৌশলময় ব্যবস্থায় পিসিমা—মনে মনে বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময়, রামপ্রসাদ তাহার মনের সংকল্প সিদ্ধিবাসনায় প্রফুল্লচিত্তে, হাস্যবদনে পিসিমার বাড়ীতে দেখা দিল। পিসিমা তখন সকল মতলব স্থির করিয়া, তাহার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া জপের মালা ফিরাইতে ছিলেন, আর এই প্রসাদেরই আগমন সম্ভাবনা করিতেছিলেন।

প্রসাদ দাওয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া, পিসিমার পদধূলি লইয়া বলিল—"কি পিসিমা! খপব কি?"

পিসিমা মালা ফিরাইতে ফিরাইতে বলিলেন—"খপর মন্দের ভাল। তবে তার খাঁই বড় বেশী। অত কম টাকায় কাজ হবে না। হাজার খানেক টাকা চাই।"

রামপ্রসাদ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"হা—জা—র—টা—কা! তা অত টাকা কোথায় পাব পিসি মা!"

পিসিমা আরও জোর করিয়া মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। তারপব বলিলেন—"কোথায় পাবে তা আমি কি জানি? ইচ্ছা থাকলে সবই হয়। তোমার বোনের এক গা গয়না। তার দুখানা না হয় সরিয়ে ফেল না কেন? আমি কমলার সঙ্গে দেখা করে, একবার ঠারেঠোরে কথাটা পেড়ে এইটুকু বুঝেছি—তাতে তার হাতেই তিনশো খানি টাকা দিতে হবে। আর তোমার একাজ হয়ে গেলে আমাকে যে গ্রাম ছেড়ে উঠে যেতে হবে—তাতো বুঝছো।

কেননা প্রথম দিনে ত খালি তোমাদের আলাপ পরিচয় আর মুখ দেখাদেখি। একদিনে ত প্রাণের আশা মিটবে না। তারপর দ্বিতীয় দিনেও কমলাকে আবার তিনশো দিতে হবে। তা যা ভাল বোধ কর।"

প্রসাদ দেখিল, তাঁহার হাত ছোট আর আমও অনেক উঁচুতে। তাহার পুঁজিপাটা যাহা কিছু—ঐ পাঁচশো টাকা। কাজেই সে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া বলিল—"পিসিমা—শোন তবে, আমার মনের কথা। গত কাল তোমায় একশো টাকা দিয়ে গেছি। আস্‌ছে কাল আর একশো তোমার মেহনতআনা বলে দোব। তারপর কমলাকে তোমার ঘরের মধ্যে দেখ্‌লেই, তিনশো টাকা ঐ কমলাকে দিয়ে দোব।"

পিসিমা রাগিয়া উঠিয়া, জপের কুশাসনের নীচে হইতে পূর্ব্ব দিনের প্রদত্ত সেই একশ টাকার নোট দাওয়ায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"নিয়ে যাও তোমার নোট! একশো টাকার এসব ফ্যাসাদে কাজে আমি হাত দিই না। জাননা কি, টাকার লোভেই আমি এই দুষ্কর্ম্ম কর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছি। আমার আরও একশো এখনি চাই।"

প্রসাদ দেখিল—সে বড় শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছে। এজন্য বলিল—"রাগ কর কেন পিসিমা! চেষ্টা করে দেখি, তুমি যা বল্লে, তা পারি কিনা? দিদির দুখানা গয়না যে উপায়ে হোক, আমায় নিতে হবে। এই কমলার জন্য আমার প্রাণ আই ঢাই কচ্ছে। এমন গয়না

নোব তাতে এই পাঁচশো টাকাই হয়ে যাবে। এই নাও আর একশো টাকা তুমি।"

পিসিমা সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন—"তা বেশ কথা! দেখ দেখি কেমন সুবোধ ছেলে তুমি। তা দুখানা ভারি গয়না, অর্থাৎ তাবিজ আর তাগাটা কিম্বা সোণার বিছে ছড়াটা এনো। আর তুমি কমলাকে নিজের হাতে সেই গয়না পরিয়ে দিও। কমলাকে দোবার জন্য তিনশো টাকা চাই। সেটা আন্‌তেই চাও, তাহলেই কাজ চলে যাবে। আর পায় যদি তা হ'লে পরশু এই কমলাকে ফুসলে ফাসলে অন্য কোথায় সরিয়ে ফেল। অবশ্য একাজেও আমি তোমার সাহায্য করবো। পিসিমা তোমার নেমক-হারাম নয়। যার টাকা খায়, ষোলআনা মন দিয়ে তার কাজ করে।"

প্রসাদ এই কথা শুনিয়া অতীব হর্ষচিত্তে—পিসিমার পদধূলি লইয়া বলিল—"তাই করবো। কমলার জন্য এখন আমি সব কর্ত্তে পারি। দিদির গহনার বাক্সর চাবি কোথায় থাকে, তাও আমি জানি। তা'হলে 'এই তোমার পাকা কথা তো পিসিমা?"

রুদ্রঠাকুরাণী বলিলেন—"নিশ্চয়ই। তবে তোমার বোনের গয়নাগুলো নেবে খুব সাবধানে। জানতো তোমার বোন্‌কে? সে জান্‌তে পাল্লে তখনি ধরা রসাতলে দেবে। আর সেই সঙ্গে আমারও নাস্তানাবুদ হবে।"

মূর্খ প্রসাদ দম্ভভরে বলিল—"দিদি তো দিদি! এমন ভাবে গয়না সরাবো, যে দিদির বাবাও তা জানতে পারবে না।

আর ধরতে পাল্লে আমার কি করবে সে? মার পেটের ভাইকে ত জেলে দিতে পারবে না।”

পিসিমা বলিলেন—“তা হলে কাল ঠিক রাত আটটার সময় এসো। কমলা আমার ঐ বড় ঘরেই থাক্‌বে। কিন্তু ঐ দুখানা গয়না, আর কমলার জন্য তিনশো টাকা চাইই—চাই। তা না হলে কিছুতেই কিছু হবে না।”

প্রসাদ বলিল—“সেজন্য নিশ্চিন্ত থাক পিসি। তাহলে সব ঠিক। কালরাত্রি আটটার পর—কেমন ত?”

পিসিমা হাস্য মুখে, নোটগুলি কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন—“তা আর বল্‌তে প্রসাদ। যখন কাজের বায়না নিলুম, তখন তোমার আর বল্‌তে হবে না!”

হৃষ্ট চিত্তে প্রসাদ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেল। তারপর দিন মধ্যাহ্নে সে সুযোগ বুঝিয়া তাহার দিদির আলমারি খুলিয়া দুখানি ভারি ভারি গহনা সরাইয়া লইল।

(২৮)

সন্ধ্যার পূর্ব্বে, প্রসাদ গহনা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার পর—বিরজা কোন বিশেষ প্রয়োজনে, গহনার বাক্স খুলিবামাত্র দেখিল—তাহার মধ্যে তাগা আর তাবিজ নাই। সে সেই ঘরের সমস্ত বাক্স পেটারা, তন্ন তন্ন খুজিয়া দেখিল। তবুও সে গহনা দুখানি পাইল না।

বিরজা তাহার মাকে ডাকিল। মলিনমুখে কপালে হাত দিয়া বলিল—“মা গো! সর্ব্বনাশ হইয়াছে!”

মা—চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ব্যাপার কি, বিরু ?"

বিরজা। আমার তাগা তাবিজ বাক্সের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয় কেহ চুরি করিয়াছে। কে এ সর্ব্বনাশ কর্লে মা ?"

বিরজার মাতা—"ওমা কি সর্ব্বনাশ হলো গো" – বলিয়া চীৎকার করিতে যাইতেছিলেন। বিরজা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল "চুপ কর ! আবাগীর বেটী। এখন মড়াকান্না কাঁদবার সময় নয়। তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। চোর সাবধান হয়ে যাবে। ধরা পড়বে না ! আর উনি শুন্‌লে—আমার লাঞ্ছনারও অবধি থাক্‌বে না।"

বিরজার মাতা, তাঁহার শোকোচ্ছাস অনেক কষ্টে সংযমিত করিয়া বলিলেন—"তা তোর যা ইচ্ছা হয়—তাই কর মা। আমি রান্না ঘরে চল্লুম। এ সব কান্নাকাটি আমি সইতে পারিনি।"

মাতা চলিয়া গেলে—বিরজা আবার চারি দিকে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিল। তবুও হারাণ জিনিসের কোন সন্ধান সে পাইল না। সে তখন পা ছড়াইয়া, চোখে আঁচল দিয়া, গহনার শোকে কাঁদিতে বসিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রসন্নকুমার এই গহনাচুরীর ব্যাপারটা যে ঘটিবে, তাহা রুদ্রপিসির কাছে পূর্ব্বেই খপর পাইয়াছিলেন। এজন্য কৌতূহলচালিত হইয়া, তিনি বিরজার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—বিরজা কাঁদিতেছে !

প্রসন্নকুমার বলিলেন—"কাঁদিতেছ কেন বিরজা ?" বহুদিনের

পর এই ভাবে আবার মিষ্ট সম্বোধন! বিরজা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রসন্নকুমারকে সব কথা খুলিয়া বলিল।

প্রসন্নকুমার বিরজাকে বলিলেন—"কাঁদিও না—চুপ কর। আমি যা বলি—তাই কর। চুপে চুপে, খিড়কীর বাগানে এখনি চলিয়া যাও। আমি এখনি সেখানে যাইতেছি। তোমার গহনা কে লইয়াছে, কোথায় রাখিয়াছে, তাহা আমি জানি। কোন প্রশ্ন করিও না। আমিও এখনি খিড়কীর ঘাটের কাছে যাইতেছি।"

বিরজা তখনই ঘরে চাবি দিয়া নীচে নামিয়া বাগানের মধ্যে গেল। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। প্রসন্নকুমার তাহার ক্ষণকাল পরে, সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে এস বিরজা।"

বলা বাহুল্য, বিরজাকে লইয়া প্রসন্নকুমার রুদ্রপিসির বাড়ীতে পৌঁছিলেন। প্রসাদ তখনও সেখানে উপস্থিত হয় নাই।

রুদ্রপিসি, প্রসন্নকুমারকে বলিলেন, "ঐ ছোট চালা-ঘরটার মধ্যে লুকিয়ে থাকগে পেসন্ন। এখানে যা ঘটবে, ওখান থেকে সবই দেখতে পাবে—শুনতে পাবে।"

বিরজা এই সব ব্যাপার দেখিয়া ভ্যাবাচাকা লাগিয়া গেল। কে যে চোর, তাহা সে অনুমান করিতেও পারিল না। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, সে স্বামীর পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠিক যখন কাঁটায় কাঁটায় আটটা—তখন রামপ্রসাদ সেখানে দেখা দিল। বলিল—পিসি মা! গহনা আনিয়াছি। কিন্তু আমার

সোণার প্রতিমা কমলা কোথায়? আগে তাকে দেখাও। তা না হলে টাকা আর গহনা আমি দিচ্ছি না।"

প্রসন্নকুমারের এক পূজারি ব্রাহ্মণ ছিল। তার নাম গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী। তাঁহার রংটা খুব ফরসা। বয়স বাইশ কি, চব্বিশ। প্রসন্নকুমার এই গোবর্দ্ধনকে মেয়েলি ধরণে কাপড় পরাইয়া, শাড়ী শাখা দিয়া সাজাইয়া, দশ টাকা পুরস্কার স্বীকার করিয়া, পিসির ঘরে সন্ধ্যার আগে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই গোবর্দ্ধনই হইতেছে তখন প্রসাদের আকাঙ্খার জিনিষ—কমলা।

পিসিমার উপদেশানুসারে, গোবর্দ্ধন ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া বিছানার উপর চুপ করিয়া, যেন লজ্জাশীলা বধুটির মত বসিয়াছিল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে।

পিসিমা প্রসাদকে বলিলেন—"এ সব কাজে হাতাহাতি দেওয়া নেওয়া। আগে টাকা দাও—তার পর ঘরের ভিতর যেও।

প্রসাদ সানন্দচিত্তে, তখনই গহনা দুখানি আর বাকি টাকাগুলি পিসির হাতে দিয়া বলিল—"এইবার হয়েছে তো।"

এই সময়ে প্রসন্নকুমার বিরজাকে লইয়া সেই গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া, প্রসাদের পশ্চাৎ দিক হইতে বলিলেন—"হবার এখনও অনেক বাকি রে হতভাগা! এ যজ্ঞের আসল মন্ত্র যে পয়জার, তা আগে হয়ে যাক্।"

প্রসন্নকুমারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর সেই ক্ষেত্রে তাহার ভগ্নীকে উপস্থিত দেখিয়া, প্রসাদ একেবারে মুসড়াইয়া পড়িল। সে যে কি করিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না।

সে চারিদিকে চাহিয়া তখনই দ্রুতবেগে সেস্থান হইতে ছুটিয়া পলাইল। প্রসন্নকুমার তাহাকে ধরিবার চেষ্টা আর করিলেন না। এই ঘটনায় প্রসাদকে আর কেহ কখনও সেই গ্রামে দেখে নাই।

বলা বাহুল্য—বিরজা তাহার গহনাগুলি ফিরিয়া পাইল। আর প্রসন্নকুমারের সস্ মাহী কিস্তির বাকী টাকাটা ও কৌশলসহায়তায় সহজে আদায় হইয়া গেল।

বিরজা বাটীতে ফিরিয়া গিয়া, রুদ্রপিসির বাড়ীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল—সবই তাহার মাকে বলিল। খালি বলা নয়—সে এই ব্যাপার লইয়া, তার মার সঙ্গে খুব খানিকক্ষণ ঝগড়া করিল। মায়ে ও মেয়েতে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর, প্রসাদের মাতা ঠাকুরাণী দেখিলেন, কন্যার বাড়ীতে তাঁহার থাকা আর পোষাইবে না। সে বাড়ীর সকলেই তাঁহার গুণধর পুত্রের কেলেঙ্কারীর কথা জানিতে পারিয়াছে। আজকাল কন্যা বিরজা, দিনরাতই মুখ ভার করিয়া থাকে। তাঁর সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কয় না। বিরজাজননী ভাবিলেন, জামাতা গৃহে তাঁহার অন্ন উঠিয়াছে। তারপর প্রসাদের কোন সংবাদ না পাইয়া, তিনি বড়ই বিচলিতা হইলেন। তাঁহার ফোঁস-ফোসানী, আর কান্নার চোটে, বাড়ীর সকলেই বড় উত্যক্ত হইয়া উঠিল।

প্রসন্নকুমার তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে লোক পাঠাইয়া জানিলেন হতভাগ্য রামপ্রসাদ ভয়ে, অপমানে, লাঞ্ছনায়, তাহার নিজ বাড়ীতেই লুকাইয়া আছে।

এখন আর বিরজার সহিত তাঁহার কোনরূপ মনোমালিন্য নাই। এজন্য তিনি, পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া, শাশুড়ীকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে পাঠানই স্থির করিলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে এটুকুও স্থির হইয়া গেল যে বিরজাজননী, মাসে কুড়িটী করিয়া টাকা বৃত্তি প্রসন্নের কাছে পাইবেন। এই বন্দোবস্তের ফলে, পরদিন একখানি ডুলি করিয়া দিয়া প্রসাদের পুণ্যবতী গর্ভধারিণীকে তাহার নিজ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

বিরজার মাতার ডুলি বাড়ীর সদর দরোজা পার না হইতে হইতেই রুদ্রপিসি কোথা হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কোন সংবাদই পিসিমার কাছে পৌছিতে দেরী হয় না। বিরজার মার উপর, পিসিমার বরাবরই খুব একটা রাগ ছিল। এজন্য তিনি মজা দেখিবার জন্য, সকল কাজ ছাড়িয়া, সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

বিরজার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া, রুদ্রপিসি একটু বিদ্রূপের সঙ্গে বলিলেন—"তা যাচ্ছ—বাছা যাও! আহা! এখানে দুদিনের জন্য এসে, তোমার কি লাঞ্ছনা আর হাড়ির হালটাই ঘটলো। তা জামাই বাড়ীতে রাজরাণীর সুখের চেয়ে, নিজের কুঁড়েঘরে আধপেটা খাওয়াও ভাল।"

পিসির এই বিদ্রূপবাণীতে বিরজার মাতা বড়ই চটিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সেখানে বিরজা বা আর কেউ উপস্থিত ছিল না। উপায়বিহীনা বিরজাজননী মন্ত্রৌষধিরুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, মনে মনে পিসিমাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। কারণ তিনি জানিতেন এই রুদ্রপিসির জন্যই এই সব কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

দিয়া কাঁদিতেছে। অবশ্য গোপালগোবিন্দ তখন সেই কক্ষে ছিলেন না।

কমলা—অপর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"অপি দিদি! বুক যে ফেটে যাচ্ছে। তোকে ছেড়ে, আমি স্বর্গে গিয়েও সুখী হবো না।"

অপর্ণার মনের অবস্থাও সেইরূপ। সে একটা মহাঝড় বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া বলিল—"থাম। থাম কমলি। জেঠামি করতে হবে না। তীর্থযাত্রার আগে কাঁদতে নেই।

অপর্ণা স্নেহভরে কমলার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল "কমলা। ভগবান এতদিন পরে তোর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কেন কাঁদছিস বোন। মোটে এক মাসের জন্য ত যাচ্ছিস। এরপর তোদের বাড়ী ঘর মেরামত হয়ে গেলে, আবার এখানে আসবি তুই। দু'জনে আবার একসঙ্গে থাকবো।"

এই কথা বলিয়া কমলা তাহার আলমারীর মধ্য হইতে একটা ছোট হাতবাক্স বাহির করিয়া তাহার চাবি খুলিল। তাহার মধ্যে কয়েকখানি দামী স্বর্ণালঙ্কার।

অপর্ণা বলিল—"কমলি। তোর মা নেই—বাপ নেই। আছি আমি—বড় বোন। শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার সময়, মেয়েকে লোকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠায়। তাই আজ আমি তোকে সাজিয়ে দিতে চাই। এই গয়নাগুলি তোকে পরতে দিলুম। যত্ন করে রাখিস। ভাবিস—এটা তোর অপি দিদির স্নেহের উপহার। তোকে আর কি আশীর্বাদ করবো বোন! তোর হাতের নোয়া অক্ষয়